২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

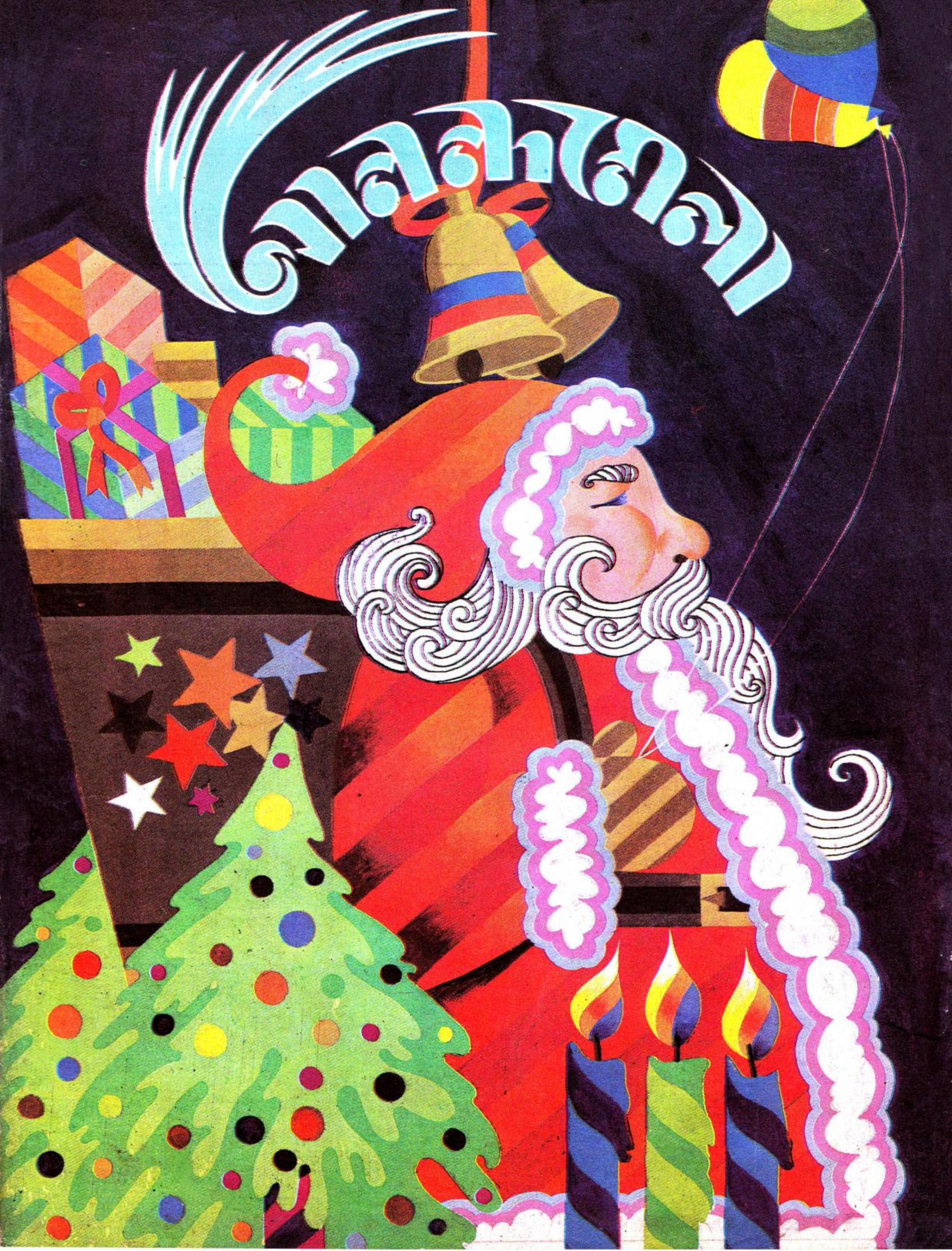

LINTAS BIN MB 12 2720 BG

আনন্দমেলা

১০ পৌষ ১৩৯২ ☐ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ ☐ ১১ বর্ষ ১৯ সংখ্যা

বড়গল্প

অভ্র বনাম শুভ্র । রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ৩৫

ইতিহাসের গল্প

আর্মাডাজয়ী সার ফ্রান্সিস ড্রেক । রবীন্দ্রনাথ ঘোষাল ২৫

গল্প

বড়দিনের স্মৃতিকথা । সুদেষ্ণা সরকার ৯

রাত্রির চলন্ত ট্রেনে । প্রভাস মল্লিক ১৩

সেই লোকটি । মঞ্জিল সেন ১৭

জঙ্গলের গল্প

মেরুর পাগলা হাতি । মঞ্জরী লাহিড়ী ২৯

জলের বিভীষিকা

মানুষখেকো মাছ পিরান্‌হা । জয় সেনগুপ্ত ৩২

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৬

শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৫২

শার্লক হোমসের গল্প

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৫

ছড়া ও কবিতা

শীত-কুটুম । রত্নেশ্বর হাজরা ৬

শীতের দিনে । সাধনা মুখোপাধ্যায় ৬

শীতের রোদ । কার্তিক ঘোষ ৬

ভাবিস কী তুই । প্রণব মুখোপাধ্যায় ২৮

পুষ্পক-প্রাইমারি । রতনতনু ঘাটী ২৮

বিজ্ঞানবিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫

জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫১

লেখাপড়া

বড়দিন কিসে বড় (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৭

কষিত···নির্বেদ···(অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৭

খেলাধুলো

রথম্যানস কাপ জিতল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ । সম্রাট রায় ৬২

হায় ভারত । অশোক রায় ৬৪

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা । সুব্রত সিংহ ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিকস

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১

সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১

অন্যান্য আকর্ষণ

সান্টাক্লসের খোঁজে । অশোক সেনগুপ্ত ১১

তোমাদের পাতা ৪৯, ডাক্তারবাবু বলছেন ৫১

ধাঁধা, শব্দসন্ধান ৫৮ ; মজার খেলা, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : জয়ন্ত ঘোষ

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সব শিশুরই
এক সুর
গেঞ্জি পরুন
কোহিনুর

কোহিনুর নিটিং মিলস্
গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক

বাংলাদেশে আইনসম্মতভাবে বিক্রির জন্য প্রতি জেলায় ডিস্ট্রিবিউটার আবশ্যক ।

যোগাযোগ কেন্দ্র :
কোহিনুর নিটিং মিলস্
১১৩ মনোহর দাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক!
"আমি আমার বাচ্চাদের, এক কাপ দুধে দু'চামচ করে পুষ্টিগুণ ও আস্বাদেভরা পানীয় বোর্নভিটা, দিনে দু'বার ক'রে দিই ।
বোর্নভিটা থেকে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টি পায় বলে আমার বাচ্চারা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি যথাযথভাবে পায়— তাইতো, পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হ'বেই খাওয়াতে ।"
MILK
Cadbury's
Bournvita
NOW SAVE Rs.2/-
SUGAR
MALT
COCOA
এটি বোর্নভিটা ভরা বর্ষ.
যার জন্য এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.
এবার প্রতি ৫০০ গ্রাঃ রিফিল প্যাকের ওপর ২ টাকা বাঁচান ।
OBM/4698/BEN

জল ছেড়ে ডাঙায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যে-সময় সব কাঁটাওয়ালা মাছেরই ফুস্‌ফুস্ ছিল, তখন তাদের একদলের মধ্যে দেখা দিল ভবিষ্যতের এক বিরাট সম্ভাবনা। এরা হল কান্‌কো পাখ্‌নাওয়ালা মাছ। জালে-পড়া সিলাকন্থ আর লাটিমারিয়া মাছের কথা মনে আছে তো ? এদের পাখ্‌না তো নয়, যেন একেকটা জবরদস্ত বৈঠা। এই রকমের পাখ্‌নাই পরে পায়ের আকার নেয়। এই সময় পৃথিবীও বদ্‌লে গিয়েছিল।

মাৎস্যযুগের গোড়ায় মাটির ওপর দেখা দেয় প্রথম উদ্ভিদ্। তার আগে কোটি কোটি বছর ধরে শুধু সমুদ্রে ছিল জলজ লতাপাতা। ডাঙা ছিল একেবারে ন্যাড়া। গোড়াকার উদ্ভিদ মাটিতে নুয়ে পড়ে থাকত। এরা ছিল ছোট্ট সাদাসিধে ধরনের। না ছিল শেকড়, না ছিল পাতা।

পরে এ থেকে মাটিতে বড়গোছের যে গাছ জন্মাল, তা ফার্ন্ বা পর্ণাঙ্গ। মাৎস্যযুগের শেষাশেষি বড় বড় ফার্নের জঙ্গলে মাঠ-ময়দান ভরে গেল। কোনও কোনও গাছ হল চল্লিশ ফুট উঁচু। ডাঙার ওপর সে-সময় পাওয়া যেতে লাগল অঢেল লতাপাতা আর ফলমূল।

তখন ঘটল এক অবাক কাণ্ড। জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসতে লাগল একের পর এক প্রাণী। প্রথম যারা কাদামাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে ডাঙায় উঠে এল, তারা ছিল উভচর। কিছুটা সময় তারা জলে কাটাত। কান্‌কো-পাখ্‌নাওয়ালা পূর্বপুরুষদের মতো তারাও ছিল লম্বা, পাতলা ধরনের। ল্যাজগুলো বেশ মোটাসোটা। ডাঙায় নিশ্বাস নেবার ফুস্‌ফুস্ আর শক্ত মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর ঠ্যাং, দুইই তাদের ছিল। সাঁতারেও ছিল পোক্ত। দিনের বেশ খানিকটা সময় তারা জলে চুনোমাছ খেয়ে কাটাত।

খরার দিনে নিরুপায় হয়ে কান্‌কো-পাখ্‌নাওয়ালা আর অন্য সব মাছেরা অনেকেই মরে ফৌত হয়ে গেল। কিন্তু টিকে রইল উভচরের দল। ঠ্যাঙের জোরে ঠাঁইনাড়া হয়ে তারা চলে যেতে পারল এমন জায়গায়, যেখানে কিছুটা জল আছে।

মাছের তুলনায় তাদের কান ছিল ঢের প্রখর। তাদের কানের ছোট ছোট হাড় এমনভাবে সাজানো ছিল যে, হাওয়ায় কম্পমান অতি সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গও তাতে ধরা পড়ত। ফলে, ভয়ের ব্যাপার থাকলে আগেভাগে তারা টের পেয়ে যেত।

ডাঙায় থাকলেও একেবারে জল ছাড়া তাদের চলত না। গোল-গোল নরম ডিম পাড়তে জলে তাদের যেতেই হত। ফুস্‌ফুস্ থাকলেও শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাত তারা বুকের মাংসপেশির চাপ দিয়ে নয়, বরং তাদের পূর্বপুরুষদের মতো হাঁ-মুখ দিয়ে। শরীরে রক্তচলাচলেরও তাদের তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। এ সত্ত্বেও এই উভচরেরা সে সময়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

প্রধান উভচরদের মাথার খুলি শক্ত বাক্স ধরনের হওয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের বলেন 'রুফ-হেড' বা ছাদ-মুণ্ডু। আস্তে-আস্তে স্থলচর আরও অনেক জীবের জন্ম হল। যেমন, বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া এক ধরনের বিছা ; তা ছাড়া শামুক, সহস্রপাদ কেন্নো, এমন কী, দু' ফুট পাঁচ ইঞ্চি পাখাওয়ালা অনেক পোকামাকড়।

'রুফ-হেড'রা লোপ পায় আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে। সেইসঙ্গে উভচরদেরও অধিকাংশই শেষ হয়ে যায়। এদের মধ্যে এখনও টিকে আছে শুধু ব্যাঙের দল।

ইতিমধ্যে উঠে এল এক নতুন জাতের জীব। পরে যারা স্থলচর হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, তারা সবাই ছিল এই নতুন প্রাণীর বংশধর।

প্রাচীন পৃথিবীতে যে-সব মাছ জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসত, তাদের অবস্থা ছিল আজকের এই মাছেদের মতো

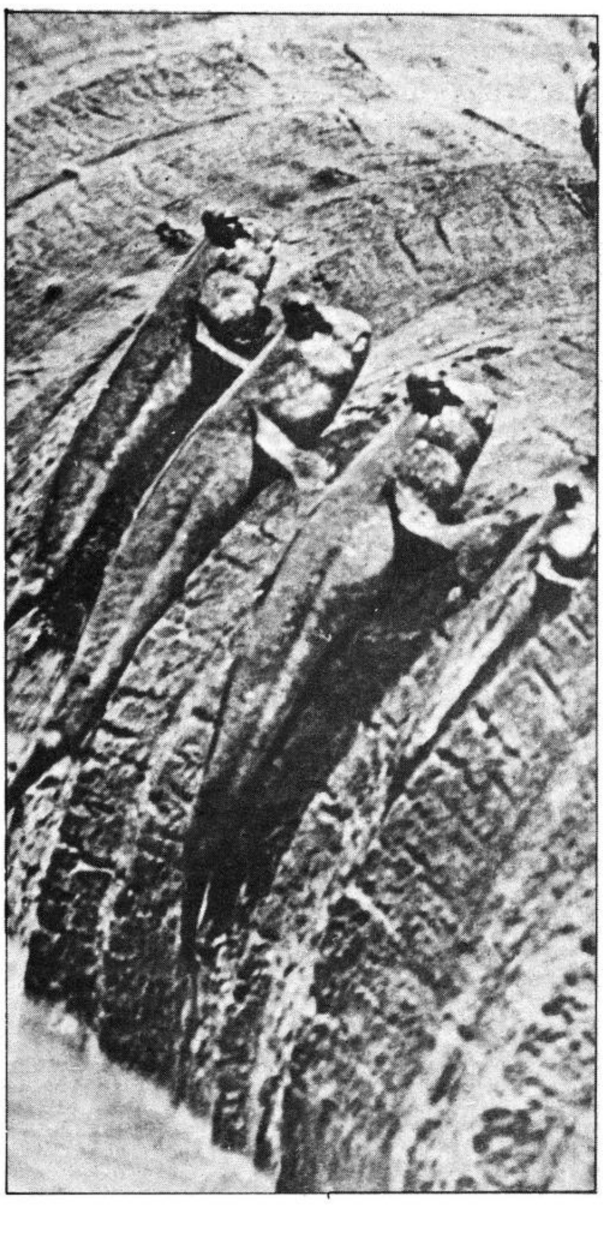

শীত-কুটুম

রত্নেশ্বর হাজরা

মাঘের শীত রে বাঘের শীত,
খেজুর রসের মিঠা,
বুড়োর শীত রে বুড়ির শীত,
সরুচাক্‌লি পিঠা ।
কাঁথার নীচে লাল পুতুল
ঘুমায় মুড়ি দিয়া,
আয় রে শীত, কুটুম শীত,
কাল পুতুলের বিয়া ।
আগুন দিমু হাত সেঁকার,
খাইতে দিমু পায়েস,
টিনের চালে আন্ধার রাত—
লেপের কোণে আয়েস ।
বনবাদাড়ে ডাকছে ফেউ
ভাম ঘুরছে আদাড়,
আলের ধারে পলাশফুল—
লাল টুকটুক মাদার ।
বালাম-ভরা দো-মাল্লাই
উজান দিচ্ছে পাড়ি,
কাল বিহানে গঞ্জে হাট,
পরশু ফিরবে বাড়ি ।
মাঘের শীত রে বাঘের শীত
রঙিন চাদর গায়ের
খইয়ের মোয়ায় নলেন গুড়
আদর মাখা মায়ের ।
পুজোয় পাওয়া নীল পুতুল
খেলতে দিমু, অল্প
পাটিসাপটায় ক্ষীরের পুর—
ঠামা'র মুখে গল্প ।

শীতের দিনে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

শীতের সকাল হাউ ডু ইউ ডু
চলছে হ্যাণ্ডশেক,
শীতের দুপুর নিউ মার্কেট
রঙ-বেরঙের কেক !
ভোজ-ভেলকির হরেক খেলা
পড়ল মাঠে তাঁবু
কোন্‌টা ছেড়ে কোথায় যাবে
ভাবছে বসে বাবু ।
কলকাতাতে উড়ে এল
সাইবেরিয়ার হাঁস
চিড়িয়াখানার সরোবরে
ভাসবে ক'টি মাস !
আলিপুরে ফুলের মেলা
ময়দানে সারমেয়,
কেউ কেউ ঠিক বাঘের মতো
কারুর কোমল দেহ !
কারও রঙ বা তুষার-সাদা
কেউ খয়েরি ছিটে,
কেক পেস্ট্রি বাবুর কাছে
হোক না যতই মিঠে
সবচে' খেতে ভাল লাগে
মায়ের হাতের পিঠে !
আস্কেপিঠে বাস্কে পুরে
উঠল রাতারাতি,
বাবু যাবে ঝিলমিলেতে
করতে চড়ুইভাতি ।

শীতের রোদ

কার্তিক ঘোষ

রোদ ফুটেছে কার্নিশে কার,
রোদ উঠেছে ছাদে,
রোদের জন্যে অন্ধ গলি
রোজ কত কী সাধে !
অবশ্য তার বয়েই গেছে
ঢুকতে গলি-ঘুঁজি,
শীতকাতুরে সবার সঙ্গে
রোদের আড়ি বুঝি !
এই মেয়েটা, শোনো, তোমার
নাম কী গেছি ভুলে,
গরম-জামা নেই বলে তাই
যাচ্ছ না ইসকুলে !
শীতকাতুরে দাদা তোমার
তারও উলের শখ,
পায়নি বলেই খুঁজছে পাড়ায়
রোদ থই-থই রক ।
হায় রে ! রোদের দাম যে চড়া
গড়ের মাঠে গেলে,
যে-কোনওদিন দেখবে হঠাৎ
বিকোচ্ছে রোদ 'সেলে'
কিন্তু ঘরে পয়সা কোথায়,
মায়ের চুড়ি দুটো,
তাও যে কাচের, সেই নিয়ে কে
রোদ দেবে একমুঠো !

ছবি : দেবাশিস দেব

সহজে ইংরেজি

বড়দিন কিসে বড়

বছর ঘুরে আবার বড়দিন এসে পড়ল। বড়দিন মানেই আনন্দের দিন। মিলি কিন্তু আসল তাৎপর্যটা জানতে চায়।

"Why do we call it *Burra Din,* Daddy?" Milly asked her father. The day is very short on the 25th December, isn't it?"

"You are right," said Mr. Roy, "it's a very short day. One of the shortest days of the year, in fact. I think what *Burra din* means is a great day, a very important day. Like *Burra sahib,* you know. I also remember a friend of mine, an army man once invited me to their great annual dinner. They used to call it the *Burra khana."*

"Oh, really, Daddy? What was it like at the army *Burra khana?"*

"It was a great event. Everyone from the commanding officer down to the youngest jawan was there. And they all ate together."

"What did you have to eat?" asked Milly. When food is mentioned, she always insists on details.

"Oh, I don't remember all the items on the menu. All I remember is that the amount of food eaten that evening was enormous. There were huge piles of fruit on the table, and they vanished in no time. Then the fish. There were not many kinds of fish, but there was plenty of it. And we had such quantities of meat."

"Bread?"

"And big loaves of good, fresh bread, too. But I do not think I had much of that. Nobody eats a lot of bread when there are so many other kinds of food to eat. We had a great time."

"A 'burra' time, Daddy?"

"A 'burra' time, Milly," said Mr. Roy.

ইংরেজিতে এমন কিছু কিছু শব্দ আছে যার বহুবচনের রূপ সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। যেমন ধরো, মাছ, কিংবা ফল। খাদ্য হিসেবে যখন উল্লেখ করা হয়, তখন মাছ এবং ফল সব সময়েই একবচন। এবারে এই রকম শব্দের কয়েকটি উদাহরণ দেখলে। (পরে ক্রমে ক্রমে আরও দেখবে।)

There were huge piles of fruit.
There were not many kinds of fish.
There were big loaves of good, fresh bread.
We had such quantities of meat.

প্রসাদ

অর্থ জানো

কষিত…নির্বেদ…

জেনে রাখো, অপুষ্টিকর খাদ্যের চেয়েও আমাদের জীবনের বেশি ক্ষতিকারক হল বাক্যের বিবর্ণ, জীর্ণ শুষ্ক শব্দাবলি, তা ভাষাকে ক্রমে দুর্বল ক্ষীণ করে তোলে। তাই শব্দ সঞ্চয় করো, যা প্রাণপ্রদ, যা অর্থে উজ্জ্বল। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **মনোরথ**—(ক) মনের রথ, (খ) দ্রুতগামী রথ, (গ) মনোহর রথ, (ঘ) অভিলাষ।

২। **পর্জন্য**—(ক) বজ্র, (খ) শব্দ ও বর্ষণকারী মেঘ, (গ) ভয়ংকর ঝড়, (ঘ) প্রচণ্ড বৃষ্টি।

৩। **কষিত**—(ক) কষায় স্বাদযুক্ত, (খ) রঞ্জিত, (গ) নিকষে পরীক্ষিত, (ঘ) বিস্বাদ।

৪। **নির্বেদ**—(ক) অনুতাপ, (খ) বিরক্তি, (গ) আবেদন, (ঘ) অনবদ্য।

৫। **সন্দিহান**—(ক) নির্ভরশীল, (খ) বিশ্বাসী, (গ) সন্দেহকারী, (ঘ) নিঃসন্দেহ।

উত্তর : ১। **মনোরথ**—(ঘ) অভিলাষ। সংস্কৃত থেকে আগত শব্দ। যেমন—'উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ ?'
২। **পর্জন্য**—(খ) শব্দ ও বর্ষণকারী মেঘ। মেঘের দেবতা বলে কখনও কখনও পর্জন্য ইন্দ্রকেও বোঝায়। যেমন, 'পর্জন্যের চলে শূন্য রথ' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)।
৩। **কষিত**—(গ) নিকষে পরীক্ষিত অর্থাৎ খাঁটি। যেমন, 'কষিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়স' (রামপ্রসাদ)।
৪। **নির্বেদ**—(ক) অনুতাপ। যথা 'ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল' (পরশুরাম)।
৫। **সন্দিহান**—(গ) সন্দেহকারী। যেমন, বন্ধুর বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

দেব-সেনাপতি

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের সঙ্গে
দাঁতের হয়তো কোনো
সম্বন্ধ থাকে না–
কিন্তু, মাড়ি সুস্থ রাখার সঙ্গে থাকে
অতি নিকট সম্বন্ধ!
আপনার মাড়ি যদি মজবুত না হয়, তাহলে নিঃশ্বাসেও দুর্গন্ধ হতে পারে— আর, তা ডাক্তারি মতেও সত্যি ব'লে প্রমাণিত—
অর্থাৎ, শুধু দাঁতের আপনি যত যত্নই নিন না কেন, কোনো লাভ হবে না —তা, সে আপনি যত স্বাদগন্ধযুক্ত টুথপেষ্টই ব্যবহার করুন।
তবে, একটি এমন প্রমাণিত উপায় রয়েছে, যা দিয়ে দাঁত ও মাড়ি দুইয়েরই যত্ন নেওয়া সম্ভব — যা হ'ল, সুবিখ্যাত ফরহ্যান্স উপায়।
ফরহ্যান্স শুধু এক সাধারণ টুথপেষ্টই নয় — এটি বিশেষভাবে তৈরী করেন এক দাঁতেরই ডাক্তার — যিনি, দাঁত সুস্থ রাখার সঙ্গে মাড়িরও যে কত অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ থাকে তা ভালরকম বুঝেছিলেন।
দুর্বল মাড়ি দাঁতকে ধরে রাখতে পারে না, যার ফলে দাঁতে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পোকা ধরতে পারে।
ফরহ্যান্স-এ এক বিশেষ অ্যাস্ট্রিঞ্জেণ্ট থাকে যা মাড়িকে সত্যি সত্যিই শক্ত করে আর দাঁতকে সুদৃঢ় ও সুস্থ রাখে আর ফলে, আপনার নিঃশ্বাসও হয়ে ওঠে সাফ ও তরতাজা।
তাই, ফরহ্যান্স ব্যবহার করা এখনও না শুরু করে থাকলে, আজই শুরু করুন। তারপর, যত বছরের পর বছর পার হতে থাকবে, তত বুঝতে পারবেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক ফরহ্যান্স-এর বিশেষ যত্নের ওপর কেন এত আস্থা রাখে।
ফরহ্যান্স – আপনার মাড়ির জন্যে তৈরী টুথপেষ্ট
Forhan's FOR THE GUMS
The toothpaste created by a dentist
এবার
এক
আকর্ষণীয়
নতুন প্যাকে!
403-GM-244 BEN

ছেলেবেলায় বাঘের গপ্পো তো আর কম শুনিনি...

বড়দিনের স্মৃতিকথা

সুদেষ্ণা সরকার

আজকাল এই এক নতুন ব্যায়রাম দেখা দিয়েছে, স্মৃতিকথা লেখা। তা অবিশ্যি লোকগুলোকেও পুরো দোষ দেওয়া যায় না। শুনেছি, হলিউট নাকি বিলেতের কোন্ একটা জায়গা থেকে বায়স্কোপ পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে আর বেচারারা কী দেখে গপ্পো নবেল ফাঁদবে। আর তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কী, এই স্মৃতিকথাটা কিন্তু খুব একটা খারাপ জিনিসও নয়। সে-সব কথা অ্যাদ্দিন বোঝা হয়ে ঘাড়ের ওপর চেপে বসে ছিল, যে-সব কথা সামনা-সামনি কারুকে বলবার জো'টি নেই, যে-সব কথার পাহাড় নামিয়ে একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচা যায়। এই যে ধরুন আজ আমার এত রমরমা, গাঁয়ের বাড়িতে এত জমিজমা, গোরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি, পোস্টআপিসে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা, আর গিন্নির গায়ে তাল-তাল সোনা, এ-সবের মূলে যে কী, তা যদি আপনাদের খুলে বলি, তা হলে কি একজনও আমায় বিশ্বাস করবেন? কিন্তু সেই রহস্যই যদি আজ স্মৃতিকথা হয়ে ছাপার অক্ষরে বের হয়, তখন কার সাধ্য অবিশ্বেস করে। তাই, এই আরম্ভ করলুম আমার স্মৃতিকথা।

শুনেছি, ছোটবেলায় নাকি বাপ-মা'য় আদর করে আমার নাম রেখেছিল যুধিষ্ঠির। তা বাপ-মায়ের দেওয়া নামের মর্যাদা আর ক'জন রাখতে পারে বলুন। তাই বয়েসকালে গোঁফ পাকতে না পাকতেই আমার চুরিবিদ্যেয় হাত পেকে গেল। ও কী মা-ঠাকুরুনেরা, সরে বসছেন যে বড়! গোড়াতেই না পষ্ট করে বলে দিইচি আমি এখন অনেক টাকার মালিক, কোন্ দুঃখে ফের চুরি করব বলুন তো? নেহাত যখন মাঝে-সাঝে সন্দ হয় যে, গুরুর দেওয়া বিদ্যেয় মর্চে ধরে যাচ্ছে, তখন কেবল এক-আধবার হাত-মক্শো করার জন্য গিন্নির পানের বাটা থেকে খয়েরটা, এলাচটা সরাই, কিন্তু তার বেশি কিছু না। ওই যে বললুম, দরকারটা কিসের।

তবে অবিশ্যি চিরটাকাল আমার এমন বাড়বাড়ন্ত ছিল না। দুধের দাঁত পড়া অবধি রাতদুপুরে লোকের বাড়িতে বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘুরে বেড়াতুম, বেশির ভাগ সময়েই সিঁদ কাটার পরিশ্রমটুকুও উসুল হত না। ব্যাটাদের এমন সন্দেহ-বাতিক আর মন এমন নিচু ছিল যে, কী বলব! গয়নাগাটি সব ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে ঘরে ঝুটো মুক্তোর গয়না রেখে ঘুমুত, তাও আবার পাহারা দেওয়ার জন্য জোড়ায়-জোড়ায় পুষে রাখত ডালকুত্তো। এদের কাণ্ডকারখানায় যখন সংসারের ওপর ঘেন্না ধরে আর কি, তখন খবর এল অমুক মাসের অমুক তারিখে নাকি মল্লিকবাড়িতে দাঁও মারার মস্ত সুযোগ। চশমাচোখে ফরসাপানা কত্তা আর তাঁর একগা গয়না-পরা আহ্লাদী গিন্নি থেকে শুরু করে ঠাকুরচকের বেয়ারা সহিস ঠিকে-ঝি মায় প্যানপ্যানে খোকাটি অবধি নাকি বড়দিনের চড়ুইভাতি করতে ডায়মন হারবার যাবেন। বাড়িতে থাকবে দেরাজ-ভর্তি আসল হিরের গয়না, চিলেকোঠার ঘরে ঝড়ু মালি আর সদর দরজায় ইয়া বিলিতি তালা। তা ছোঃ, বিলিতি তালায় কি আর এ-শর্মাকে আটকানো যায়! আর ঝড়ু

ব্যাটারও ভারী ভূতের ভয়। সন্ধে হতে না হতেই সেই যে কম্বলের তলায় ঢুকবে, তাপ্পর সারারাত কাবার হয়ে পাখপক্ষীর ডাক না শুনলে আর টিকিটিও বের করবে না। ব্যস, তার মধ্যেই কেল্লা ফতে।

ভেতরের রাস্তার অলিগলি দিয়ে শ্যামবাজার থেকে বাগবাজারের মল্লিকবাড়িতে পৌঁছতে ঠিক ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট লাগল, তাপ্পর সিঁদকাঠি বাগিয়ে ভেতরে ঢুকতে আরও পাঁচ মিনিট। অবিশ্যি আমার হাতে যে ঘড়ি ছিল তা নয়। হদ্দ গরিব লোক, গায়ে একখানা র‍্যাপারই নেই তো ঘড়ি কেনার পয়সা কোথায় পাব। নেহাত কাছে-পিঠের কোনও এক বাড়িতে ঢংঢং করে বারোটা বাজল বলে সময়টা ঠাওর করতে পারলাম। সিঁদ কাটতে পুরো পাঁচ মিনিট নেওয়া অবিশ্যি আমার মতো লোকের কাছে লজ্জার ব্যাপার। তবে কিনা, বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল, বড়দিনের রাত তো, হাত পা যেন শীতে অবশ হয়ে আসছিল।

ভেতরে ঢুকে প্রথমে খানিকক্ষণ টাইট করে চোখ বুজে রইলুম, যাতে অন্ধকারটা তাড়াতাড়ি চোখে সয়ে যায়। ইচ্ছে করলে অবিশ্যি আমার ঘেরটোপ দেওয়া টর্চ কেন, ঘরের আলো অবধি জ্বালতে পারতাম, দেখবেটা কে! কিন্তু বললে হয়তো আপনারা হাসবেন, আমাদেরও তো কিছু রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। আর, এতে যে পরে অব্যেসটাই খারাপ হয়ে যাবে না, তাই বা কে বলতে পারে! সুতরাং, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, মনে মনে ঘরের পেলানটা আউড়ে নিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিঃশব্দে গিন্নিমার খাসদেরাজের দিকে এগুচ্ছি, এমন সময়ে নিজের কানে পষ্ট শুনলুম কোথায় যেন একটা খচরমচর আওয়াজ হচ্ছে। সোঁদরবনের জঙ্গলের ধারে হোগলার তৈরি কুঁড়েঘরে যখন কাঠুরেরা মাঝরাতে ঘুমে কাদা, তখন একপেট খিদে নিয়ে ভাঁটা-ভাঁটা চোখে দক্ষিণরায়ের চেলারা এসে চুপিসারে দরমার দরজার ওপারে ইয়া বড়-বড় নখ দিয়ে যেমন শব্দ করে, অবিকল তেমনি আওয়াজ। আমি অবিশ্যি কখনও সোঁদরবনের ধারকাছ মাড়াইনি, দক্ষিণরায়ের চেলাদের সঙ্গেও কখনও সামনা-সামনি মোলাকাত হয়নি, কিন্তু ছেলেবেলায় বাঘের গপ্পো তো আর কম শুনিনি। আমি হলপ করে বলতে পারি, সে-আওয়াজে আর এই আওয়াজে একটুও ফারাক নেই। ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে আসতে লাগল, গায়ের লোমগুলো অবধি খাড়া-খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। কে জানে এই নিঝুম ঘরে ও কিসের শব্দ! বাঘ হতে পারে, সাপখোপ হতে পারে, এমন কী খুনের দল হওয়াও বিচিত্র নয়। মল্লিককত্তার ওপর অ্যায়সা রাগ হতে লাগল যে কী বলব। আমি নিরীহ মনিষ্যি, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, দু'চারটে হিরের গয়না পেলেই খুশি হয়ে চুপিসারে চলে আসতুম, সেই আমাকেই কিনা এত হেনস্থা করা, খুনেগুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া! ছিঃ।

অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি আর সেই হাড়কাঁপানো শীতেও কুলকুল করে ঘামছি, এমন সময়ে—উরি বাবা গো—দুমদাম ধড়াস করে একটা বিকট শব্দ! তাপ্পর আমারই পামশুর ওপরে ধপাস করে কী যেন একটা ভারী জিনিস পড়ল। তখনই মুচ্ছো যেতাম, যদি না জিনিসটা আপনা থেকেই উঠে দাঁড়াত, তাপ্পর গায়ের ধুলো ঝেড়ে ব্যাজার গলায় বলত, "নাঃ, এবার দেখছি রিটার না করলেই নয়। এই বুড়ো হাড়ে কি আর এত ধকল পোষায়! কই রে বাবা, আলোটা আবার গেল কোথায়!"

বলেই, আমি হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে হাঁইমাই করে ওঠার আগেই, টেবিল চেয়ারের সঙ্গে কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে দিয়ে, আলোর বোতামটা টিপে দিলে। অমনি ঝকঝকে বিজলি আলোয় ঘরের মধ্যেকার ঘুটঘুটে রাত দিন হয়ে গেল। আর সেই আলোতে দেখলুম, আগাগোড়া লাল পোশাক পরা, মাথায় লাল টুপি, লাল টুকটুকে গাল, কেবল কোমর অবধি দুধসাদা দাড়ি, ইয়া মোটা, কাঁধে ঝুলি, এক আশ্চর্য বুড়ো তখনও ব্যথার চোটে কাতরাচ্ছে। এত অবাক হয়ে গেসলুম যে, সুট করে খাটের তলায় ঢুকে পড়ার কথা অবধি মনে আসেনি। যেই আমার ওপর চোখ পড়া, অমনি বুড়ো ব্যথা-ট্যথা ভুলে তেরিয়া হয়ে তেড়ে এল, "কী রে ব্যাটা ঝড়ু, বচ্ছরান্তে একদিন লোকজন বাড়ি নেই কি হাতে সগ্যো পেয়েছিস, না? হতভাগা, জানিস না আজ বড়দিন, ঘরে ঘরে নিদেনপক্ষে মোমবাতিটা অন্তত জ্বালিয়ে রাখতে হয়! অকর্মার ঢেঁকি, চিমনিটাই বা এত নোংরা করে রাখিস কেন বলতে পারিস! ঝুলের চোটে আট্টু হলেই দম বন্ধ হচ্ছিল আর কি। দাঁড়াও, আজই তোমায় তাড়ানোর ব্যবস্থা করছি।"

হাত জোড় করে বললুম, "আজ্ঞে কত্তা, আমি সামান্য মনিষ্যি, আমাকে তাড়ানোর উদ্‌যোগ করে আর খামোখা কষ্ট করবেন কেন, বলেন তো আমি নিজে থেকেই বিদেয় হই। তবে অধমের একটা নিবেদন ছিল, আমি যুধিষ্ঠির, ঝড়ু নই।"

এই অবধি পড়ে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই হাসাহাসি করছেন। বোকাটা বলে কী, আগ বাড়িয়ে অমনি অমনি ধরা দিতে আছে! কিন্তু কী করব বলুন মা-ঠাকরুনেরা, চোর-ছ্যাঁচোড়েরও তো প্রেসটিচ বলে একটা কথা আছে। হাতের দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে যুধিষ্ঠির হতভাগা কখনও ডিউটিতে ফাঁকি দিইচে, এমন অপবাদ শত্তুরে অবধি দিক দেখি!

বুড়ো কত্তাও খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। তাপ্পর সামলে নিয়ে বললেন, "অ, তবে তুমিই বুঝি নতুন খাসব্যায়রা! চিমনি ঝাড়াটা অবিশ্যি তোমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, তবে বাছা, আমার মুখ চেয়েও তো বচ্ছরকার এই একটি দিনে সেটি খানিক সাফসুতরো করতে পারো। দেখছই তো, মোটা মনিষ্যি। চিমনি ঠিক না-রাখলে ভেতরে ঢুকি কী করে।"

সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম, "কেন কত্তা, সদর-দরজা দিয়ে ঢুকলেই তো পারেন!"

তিনি একহাত জিভ বের করলেন, "কী যে বলিস, তা'লেই হয়েছে আর কি! লোকজনে টের পেয়ে যাবে না? তা'লে কি মনে করিস আমি জন্মেও ছাড়া পাব! সারাটা জীবন বন্দী হয়ে কাটাতে হবে। দেখিস বাবা, আমার সঙ্গে যে তোর দেখা হয়েছিল, সে-কথা ফাঁস করিস না যেন।"

শুনে ধড়ে প্রাণ এল। ওঃ, এই ব্যাপার! একগাল হেসে বললুম, "একদম চিন্তা করবেন না স্যর, আপনি যা আমিও তাই। তবে, বেয়াদবি মাপ করবেন, দুটো প্রশ্ন জাগছে। এই বয়েসে চিমনি দিয়ে না ঢুকে সিঁদ কাটলেই কি বেশি সুবিধে হত না? আর, আপনিও কি হিরের গয়নার জন্য এয়েচেন?"

বুড়ো একেবারে মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলেন, "মেলা বাজে বকিস না তো। সেই কবে থেকে চিমনি দিয়ে ঢুকে ঢুকে

গোঁফদাড়ি পেকে গেল, আর বাছাধন এসেছেন নতুন কথা বাতলাতে ! আর তা ছাড়া, হিরের গয়নার জন্য এসে কী লাভটাই না হবে শুনি ! বলি ব্যাটা গোমুখ্যু, জন্মেও কখনও শুনেছিস যে, ছোট ছেলেরা হিরের গয়না নিয়ে খেলা করে, হিরের জন্য বায়না ধরে ? এই তো, আমার ফর্দতেই তো লেখা আছে কী কী চাই । একটা লাটাই, দুটা চাঁদিয়াল ঘুড়ি, একটা ফুটবল আর একজোড়া সাদা ইঁদুর ।"

এই বলে, অবাক কাণ্ড, ঝুলি থেকে এক এক করে লাটাই ঘুড়ি ফুটবল সব বের করে বিছানার ওপর থরে-থরে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন ।

ছাড়া পেয়েই ইঁদুরছানা দুটো বিছানার চাদর চিবুতে লাগল মহানন্দে । সেই দিকে তাকিয়ে বুড়ো একটা মস্ত বড় নিশ্বাস ফেলে উদাস গলায় বলতে লাগলেন, "কদ্দিন ভেবেছি এসব উৎপাতের জীব আর আনব না । ছেলেপুলেগুলো বড় বোকা হয়, কী চাইতে হয় জানে না । কিন্তু কী আর করা, মানসম্মান বলে একটা কথা আছে তো । আজ যদি কোনও খোকাখুকি বলে যে, বড়দিনের দিন সান্তা-বুড়োর কাছে অমুক জিনিস চেয়ে পেলুম না, তবে এই বুড়ো বয়েসে মাথা হেঁট হবে না ? নাঃ, তোর সঙ্গে বকবক করতে করতে রাত কাবার হয়ে গেল দেখছি । আমার আর একদণ্ড থাকার জো নেই । বলে ফ্যাল্ শিগগির, কী চাই তোর ।"

আশ্চর্যের চোটে গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছিল না । অতি কষ্টে ঢোঁক গিলে মিনমিন করে বললুম, "আজ্ঞে, যদি কয়েকটা হিরের গয়না পাই—"

"পাবি না তো কী, আমি কি তোর সঙ্গে মশকরা করছি !" এই বলে তাড়াহুড়ো করে ঝুলির ভেতর থেকে বের করে আনতে লাগলেন পেল্লায় সব জড়োয়ার গয়না । রতনচূড়, সীতাহার, টায়রা, কানপাশা, আরও কত কী ! পায়রার ডিমের মতো বড় সেই সব হিরের গা থেকে যেন আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠছিল । আমি প্রায় মুচ্ছো যাচ্ছিলুম আর কি !

দেওয়া-থোওয়া সেরে বুড়ো কত্তা হন্তদন্ত হয়ে আমারই কাটা ফোকর দিয়ে সুড়ুত করে বাইরে বেরিয়ে এলেন । পেছন পেছন আমিও । দেখি, সদর-দরজার সামনে এক পেল্লায় ঠেলাগাড়ির মতো গাড়ি দাঁড়িয়ে । তার চাকা নেই, কিচ্ছুটি নেই, শুধু গোরুর গাড়িতে যেমন বলদ জোতা থাকে, তেমনি রাশ-পরা দুই-দুই হরিণ অধৈর্য হয়ে শিং নাড়ছে আর খুরে-খুরে আওয়াজ তুলছে । গলায় তাদের রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, আর চেহারার কী চেকনাই ! আমাদের চিড়িয়াখানায় কখনও এমনটি মিলবে না । ঠিক যেন ভিন গ্রহের বাসিন্দে ।

বুড়োকত্তা তো পড়িমরি করে তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েই সেই আজব ঠেলায় উঠে বসলেন । তাপ্পর, কী আর বলব মা-ঠাকরুনেরা,আপনারা কি কেউ বিশ্বেস করবেন ? কিন্তু নিজের চোখের দেখাকে সন্দ করব কী করে ? পষ্ট দেখলুম, দুই হরিণের পিঠে দু'জোড়া ডানা গজাল, ঠিক যেন গপ্পে শোনা পক্ষিরাজ ! তাপ্পর তারা হাউইয়ের মতো শোঁ করে ওপরে উঠে গেল । চক্ষের নিমেষে বুড়োকত্তা, তাঁর ঝুলি, তাঁর লাল জোব্বাজাব্বা, সাদা দাড়ি, লাল টুপি মায় কাঁধের ঝুলি, সব সমেত এক্কেবারে ভোজবাজির মতো উবে গেলেন ।

এবার আমি সত্যি-সত্যিই মুচ্ছো গেলুম ।

ছবি : দেবাশিস দেব

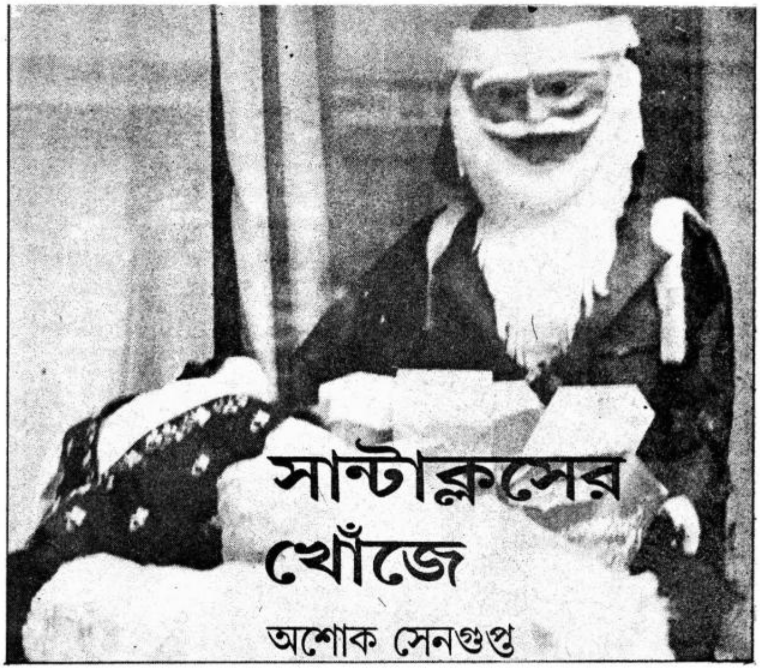

সান্টাক্লসের খোঁজে

অশোক সেনগুপ্ত

খ্রিস্টমাস ডে আর নতুন বছরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে সান্টাক্লসের হাজির হওয়ার নানান গল্প । লাল জামা পরে পিঠে উপহারের বোঝা নিয়ে সাদা দাড়ি নাড়তে-নাড়তে বুড়ো সান্টাক্লস বোধহয় চিরকালই বয়ে বেড়াবে শিশুদের খেলনার ঝুলিটা । কিন্তু কোথা থেকে এল এই সান্টাক্লস ! চতুর্থ শতকে তুর্কির 'মায়রা' নামে এক জায়গায় একটি গির্জার প্রধান উপাসক ছিলেন সেন্ট নিকোলাস । ভাল কাজ করার জন্য খুব সুনাম ছিল তাঁর । এশিয়া মাইনর থেকে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কথা । সেখান থেকে আদি পর্তুগিজ বাসিন্দারা আমেরিকায় প্রচার করে বুড়োর গল্পগাথা ।

ইতিহাসে অবশ্য সেন্ট নিকোলাস সম্পর্কে খুব বেশি কিছু পাওয়া যায় না । তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত কাহিনীগুলির অধিকাংশই কল্পনা-মিশ্রিত । খুব অল্প বয়সে গির্জার উপাসক হন তিনি । শোনা যায়, এক ব্যবসায়ীর তিন কন্যার বিয়ের জন্য তিনটি ঝুলিতে সোনা ভরে দিয়েছিলেন সান্টাক্লস । জানলা দিয়ে ঝুলিগুলি ফেলবার সময় একটা ঝুলির মুখ খুলে যায় । সোনা গিয়ে পড়ে একটি মোজার মধ্যে । এখনও শিশুদের বিশ্বাস, বড়দিনের ভোরে মোজায় হাত গলালে পাওয়া যাবে সান্টাক্লসের দেওয়া উপহার ।

প্রাচ্যের খ্রিস্টানদের কাছেও খুব জনপ্রিয় ছিলেন সেন্ট নিকোলাস । বাইজেন্টাইনের রাজকন্যা থিওফানো নিকোলাসের ধর্মকথা জার্মান ভাষাভাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করেন । থিওফানো পরে সম্রাট দ্বিতীয় অটো'কে (সাম্রাজ্যকাল ৯৭৩—৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) বিয়ে করেন । নিকোলাসের কথা ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যাণ্ডে ।

পর্তুগিজদের অধিকাংশই ছিলেন প্রোটেস্টান্ট । প্রিয় সেন্ট নিকোলাসকে তাঁরা বলতেন, 'Sinter Klaas' । নিউ আমস্টারডামের (এখনকার নিউ ইয়র্ক) পর্তুগিজরাও বে বিপশ ডে পালন করতেন । উৎসব এভাবে ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যাণ্ডের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে । ১৮০৯ সালে ওয়াশিংটন আর্ভিংয়ের লেখায় পাওয়া যায় সান্টাক্লসের চেহারা বা আচরণের নানা বিবরণ । তবে সান্টাক্লসের এখনকার রূপের ধারণাটা পুরোপুরি পাওয়া গিয়েছিল ১৮২২ সালে ক্লিমেন্ট মুরের লেখা 'ভিজিট ফ্রম সেন্ট নিকোলাস' কবিতায় ।

ধোলাইয়ের পর ধোলাই…প্রতি ধোলাই !
পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ -এর ধোলাই এমন সাদা, যেন নতুন !

প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তাজা, তেমনিই ধবধবে সাদা……যেন সদ্য কেনা প্যাকেট থেকে বার করা।

কারণ, পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো…… অনেক শক্তিশালী, অনেক রক্ষাকারী। এতে রয়েছে এমন শক্তি যা কাপড়ের গভীরে পোঁছে সাফ করে. আর এখন এতে ফেনাও রয়েছে অনেক বেশী।

সার্ফ কাপড়ের বেয়াড়া ময়লাও তুলে বার করে দেয় – তাই শুভ্রতাও হয় দীর্ঘস্থায়ী—আর, সার্ফ কাপড় রাখে সুরক্ষিত……সবসময় নতুনের মত। সাদা, রঙীন, বিশিষ্ট বা আটপৌরে—সবকিছুকেই সার্ফ করে রাখে—সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সাদা……নতুনের মত সদাসর্বদা !

ধোলাইয়ের তো হাজার পাউডার আছে, কিন্তু পরিবারের সবার জামাকাপড়ের জন্যে আপনার ভরসাযোগ্য হ'ল – একমাত্র সার্ফ !

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা, কাপড় নতুন দেখায় সদা!

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS SU 323 2720 BG

হঠাৎ আমার চোখ গিয়ে পড়ল লোকটার জুতোর দিকে...

রাত্রির চলন্ত ট্রেনে

প্রভাস মল্লিক

ডিসেম্বর মাসের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাজারিবাগ শহর থেকে বিয়াল্লিশ মাইল বাসে এসে যখন রোড স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজতে বেশি দেরি নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটলাম। লোক নেই বললেই হয়, এত ঠাণ্ডায় কে-ই বা এই রাত্রির ট্রেন ধরবে। আমাকে পরের দিন কলকাতায় পৌঁছতেই হবে; অফিসের একটা জরুরি কাজ আছে। ট্রেনে যে উঠতে পারব, তারও নিশ্চয়তা নেই। কারণ অত রাত্রে সবাই ভেতর থেকে লক্ করে ঘুমোয়, দরজা খুলতে চায় না। ট্রেনের ঘন্টা পড়ল। ছোট সুটকেস্টা হাতে নিয়ে কুলির নির্দেশে যেখানে টু-টিয়ার স্লিপারের বগি দাঁড়ায়, সেখানে অপেক্ষা করছি। কপাল ভাল বলতে হবে, টু-টিয়ারের টিকিট কালেক্টার দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার অনুরোধে দরজা খুলে দিলেন। আমার পিছু-পিছু আরও দু'চার জন যাত্রী উঠে পড়ল। ভিতরে জানলার পাশে একটা খালি সিট পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

ট্রেন ছেড়ে দিল। কামরায় সবাই অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আমার সিটের উলটো দিকে দুটো পাশাপাশি বার্থে শুয়ে আছেন এক বাঙালি ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলার কোলের কাছে তিন-চার বছরের একটি ছেলে কেঁদে উঠতেই তিনি উঠে বসে হুকে ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে একটা বোতলে গরম জল ঢেলে দুধ তৈরি করতে লাগলেন, সিটের নীচ থেকে বেবিফুডের টিন বার করে। ওঁর স্বামীও উঠে বসেছেন। আমার সঙ্গে যারা উঠেছিল, তাদের মধ্যে একজন বগলে একটা সরু বেডিং নিয়ে এতক্ষণ জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাঙালি ভদ্রলোককে উঠতে দেখে, তাঁদের দুই বার্থের মাঝের জায়গাটুকুতে তার বেডিং বেছাতে পারে কি না, ভাঙা-ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল। ভদ্রলোক যখন বললেন যে, তাঁর কোনও আপত্তি নেই, লোকটি তখন তার বেডিং বিছিয়ে জুতো পরেই শুয়ে পড়ল। লোকটির বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। পরনে পাঞ্জাবি, অবশ্য ভেতরে ফুল-স্লিভ্ সোয়েটার, ঢোলা পাজামা, মাথায় বাঁদুরে টুপি গুটিয়ে গোল করে পরা।

ট্রেন দুর্বার গতিতে চলেছে। আমার চোখে ঘুম নেই। মেঝেতে শয়ান লোকটির নাক ডাকতে শুরু করেছে। দরজা-জানলা বন্ধ বটে, কিন্তু কাঠের সিট ও জানলার শার্সি বরফের মতো ঠাণ্ডা। লোকটিকে দেখে মনে হল, এই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করতে সে অভ্যস্ত।

আমারও কখন ঝিমুনি এসেছে। ট্রেন হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। আমিও ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বাইরে তাকিয়ে দেখি, না, কোনও স্টেশন নয়, সম্ভবত সিগনাল না পেয়ে ট্রেন থেমে গেছে। দু'ধারে ঘন জঙ্গল, সামনে একটা ব্রিজ মনে হচ্ছে। ট্রেনের এই ঝাঁকুনিতে বাচ্চাটারও ঘুম ভেঙে গেছে। সে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। ভদ্রমহিলা উঠে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছেন। ছেলে কিছুতেই থামে না। ভদ্রমহিলা তখন সিটের নীচে হাত বাড়িয়ে সুটকেস থেকে কিছু বার করছেন বলে মনে হল। বোধহয় লজেন্স কি চকোলেট হবে। হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে খুব উত্তেজিত মনে হল। তিনি সুটকেসটা বার্থের ওপর তুলে জিনিসপত্তর তোলপাড় করে কী খুঁজছেন যেন। মনে হল, না পেয়ে স্বামীকে নাড়া দিয়ে তিনি তুলে দিলেন। আস্তে-আস্তে বলছেন আমার কানে এল, "দুধের টিনটা বার করবার সময় এই শার্টটায় জড়িয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু সুটকেস তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও সেটা পাচ্ছি না।"

ওঁর স্বামী ঘুম-জড়ানো চোখে বললেন, "দ্যাখো ভাল করে। নিশ্চয় ভেতরে আছে। কোথায় যাবে আবার।"

ভদ্রমহিলা আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি সব তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, নেই। সর্বনাশ, ট্রেনের টিকিট দুটোও তো ওরই মধ্যে ছিল।"

ভদ্রলোক উঠে পড়ে সুটকেসটা তাঁর বিছানার ওপর রেখে খুঁজতে শুরু করলেন। খুঁজে না পেয়ে দেশলাই জ্বেলে নীচের দিকটা দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ঠিক চাবি লাগিয়েছিলে তো?"

ওঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন, "সুটকেসের গায়ের চাবি ছাড়া এই ছোট পেতলের তালাটাও লাগিয়ে আমি ভ্যানিটি ব্যাগে এই

মামণি ঠিক জানে, কখনো পুড়ে গেলে কি করতে হবে।

মামণি যে শিখেছিল দিদার কাছে

সত্যিই. মামণি আমার সোনা-সোনা। সেদিন কি হয়ে ছিল জানো ? আমার পুতুলের কাপড়টা মামণি ইস্ত্রি করছিল। আমি তো দুষ্টু ছটফটে। গরম ইস্ত্রিরতে হাত দিয়ে ফেলেছি। আঙুল পুড়ে কি জ্বালা। ভাগ্যিস মামণি বার্নল লাগিয়ে দিল। মামণি বলল পুড়ে গেলে দিদাও এই রকম বার্নল-ই লাগাতো। পুতুলসোনা তোমার পুড়ে গেলে আমিও বার্নল লাগিয়ে দেব। ঠিক কিনা মামণি। ঠিক বলেছি বার্নল !

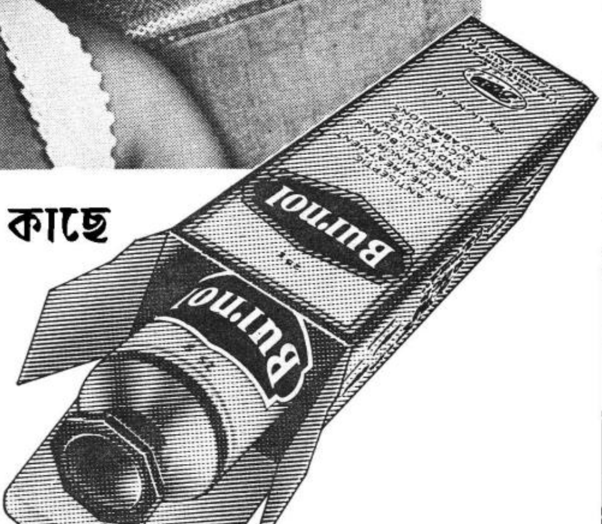

ঘরে-ঘরের ভরসাস্থল...

বার্নল

BL 2078

দ্যাখো চাবি রেখে দিয়েছি। লজেন্স বার করতে গিয়ে দেখি তালায় হাত দিতেই খুলে গেল।"

দুজনকেই খুব উদ্বিগ্ন দেখে আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের কিছু হারিয়েছে মনে হচ্ছে ?"

ভদ্রলোক সাবধানে মেঝেয়-শোয়া লোকটিকে ডিঙিয়ে আমার কছে এসে বললেন, "ম্যানিব্যাগটা পাওয়া যাচ্ছে না। মণিকা, মানে আমার স্ত্রী, দুধের টিন বার করবার সময় ওর মাথার কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে সুটকেসের মধ্যে আমার একটা শার্টে জড়িয়ে রেখে দেয়। চাবিও লাগিয়ে দেয়। এখন দ্যাখে, সুটকেসের চাবি খোলা। ওর মধ্যে মানিব্যাগটা নেই। তাজ্জব ব্যাপার। ওর মধ্যেই ছিল আমাদের ট্রেনের টিকিট, আর যা-কিছু টাকা।"

আমার মুখে কথা নেই। আমি ও মেঝের ওই লোকটি ছাড়া কাছেপিঠে কেউ নেই। ওঁদের সন্দেহ আমাদের ওপর পড়াই স্বাভাবিক। আমি বললাম, "দেখুন, আমি জেগেই ছিলাম, ট্রেনে বড়-একটা আমার ঘুম হয় না। তবে আজ এই ঠাণ্ডায় বাসে বিয়াল্লিশ মাইল এসেছি হাজারিবাগ শহর থেকে, তাই একটু ঝিমুনি এসেছিল। নীচের ওই লোকটি তো উঠে থেকেকেই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, ওকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ও হ্যাঁ, আমার ব্রিফকেস্‌টা খুলে দেখাচ্ছি, এতে অফিসের কিছু কাগজ, একটা তোয়ালে ও লুঙ্গি ছাড়া কিছু নেই, আমার কোট-প্যান্ট সার্চ করে দেখুন।"

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, "ছিঃ, আমাদের মন অত ছোট নয়, আমরা লোক চিনি।"

ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটিকে নাড়া দিয়ে তুলে দিলেন। সে হাই তুলে উঠে রসল ও বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হয়েছে ? এত হল্লা কিসের ?"

ততক্ষণে টিকিট কালেক্টার ও দুজন ছোকরা-যাত্রী জেগে উঠে এসেছে। সব শুনে তারা তার বেডিং ও জামা-পাজামা সার্চ করতে বলল। আশ্চর্য হলাম, লোকটা একটুও উত্তেজিত কি বিচলিত হল না। সবাই মিলে তার বেডিং জামা-কাপড় তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল, কিছুই পাওয়া গেল না। কথায় কথায় জানতে পারলাম বাঙালি ভদ্রলোক থাকেন গুয়াহাটিতে। একটা বিয়ে উপলক্ষে বেনারসে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীর মুখে কোনও কথা নেই, বিভুঁইয়ে কী বিপদ। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটি দরজার কাছে বেডিংয়ের ওপর বসে বিড়ি টানছে। টিকিট কালেকটার ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "সম্ভবত লোকটা আসানসোলে নেমে যাবে। আসানসোল আসতে দেরি নেই।"

আমার মন বলছে, লোকটা ভীষণ ধূর্ত, আর এটা ওরই কাজ। আমি আমার ব্রিফকেস থেকে পেনসিল-টর্চটা বার করে সিটের নীচে ফেলে তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। এক কোণে ঢাকা দেওয়া বেতের সাজি, বাচ্চার জামা-প্যান্ট কাঁথা রাখবার জন্যে। সেটা টেনে বাইরে আনলাম। কী মনে হল, ঢাকা খুলে উপুড় করে দিতেই দেখি, ঝপাস করে নীচে পড়ল মানিব্যাগটা। ময়লা কাপড়ের সঙ্গে ভদ্রলোক সেটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি খুলে দেখলেন, ট্রেনের টিকিট দুটো রয়েছে বটে, কিন্তু টাকা নেই। ব্যাগে নাকি আটটা একশো টাকার নোট ছিল।

ট্রেন আসানসোলের দিকে এগিয়ে চলেছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। হঠাৎ আমার চোখ গিয়ে পড়ল লোকটার জুতোর দিকে। মোটা হিল-দেওয়া, সে একবারও পা থেকে জুতো খোলেনি। ভদ্রলোক তখন মরিয়া। আমার কথা শুনে তাকে জুতো খুলতে বললেন। লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "তার মানে ? জুতো খুলব কেন ?" সবাই পীড়াপীড়ি করায় শেষপর্যন্ত জুতো-মোজা সে খুলল বটে, কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই পাওয়া গেল না। অবজ্ঞার হাসি হেসে লোকটা তখন আবার জুতো পরতে যাবে, হঠাৎ আমার সুরজিৎদার কথা মনে পড়ে গেল। সুরজিৎদা মস্ত গোয়েন্দা, আমার পিসিমার ছেলে। একবার নাকি ফাঁপা জুতোর হিলের ভেতর থেকে তিনি দুটো হিরের ইয়ারিং উদ্ধার করেছিলেন। লোকটার হাত থেকে জুতো-জোড়া কেড়ে নিয়ে আমি ডান পায়ের জুতোর হিলটা মেজেতে সজোরে ঠুকতেই সেটা একদিকে সরে গেল, আর তা থেকে পাকানো ক'টা একশো টাকার নোট ছড়িয়ে পড়ল। বাঁ পায়ের হিল থেকে পড়ল একটা ছোট্ট স্ক্রু ড্রাইভার, মুখটা বাঁকানো। সবাই তো স্তম্ভিত। ভদ্রলোক রাগে গরগর করছিলেন। প্রথমেই চালালেন হাত। বিরাট হাতের এক থাপ্পড় গালে পড়তেই লোকটা 'বাপ রে' বলে বসে পড়ল। অন্য যে দুজন যাত্রী এসেছিলেন, তাঁদেরও চড় ঘুসি পড়তে লাগল সমানে। লোকটার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে টেনে আনলেন। লোকটার বাঁদুরে টুপিটা মাথা থেকে খুলে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে গালের কাছে চেপে ধরে সে তার গোটানো বেডিংটার ওপর কাত হয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল। জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছে। ট্রেন তখন ধীর গতিতে চলেছে, কাছেই স্টেশন আসছে বলে মনে হল।

ভদ্রলোকের স্ত্রী গোটানো নোটগুলো গুনে বললেন, "পাঁচটা নোট রয়েছে, আটটা থাকবার কথা।"

বাকি তিনটে নোট কোথায় যেতে পারে! ভদ্রলোক আবার হাত চালাতে যাচ্ছিলেন, ওঁর স্ত্রী হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিলেন।

বাকি নোট কোথায় রেখেছে, আমি ও টিকিট কালেক্টার ওকে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। ওর মুখে কথা নেই, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ আমার কী মনে হল, বাঁদুরে টুপিটা ওর হাত থেকে টেনে নিতে গেলাম। দেখি ও চেপে ধরে আছে। অবশ্য ওর টুপি খুলে আগেই দেখা হয়েছিল। আমি হ্যাঁচকা টানে টুপিটা ওর হাত থেকে টেনে নিলাম। আমার সন্দেহই ঠিক। বাঁদুরে টুপির ধারগুলো গুটিয়ে গোল করে ওর মাথায় পরা ছিল। খাঁজ খুলতেই অন্য তিনটে নোট বেরিয়ে পড়ল।

লোকটার ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে, তার ওপর ওকে রেলওয়ে পুলিশের হাতে দিলে ঝামেলা অনেক, ভদ্রলোককে সেই গুয়াহাটি থেকে যতবার কোর্টে দিন পড়বে ততবার আসতে হবে, এই সব চিন্তা করে টিকিট কালেকটারের কথামতো ছোট একটা নির্জন স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতেই ওকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে লোকটা একটা বেঞ্চির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর-একজন যাত্রী দেখি কখন অন্য দরজা দিয়ে নেমে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রেন ছেড়ে দিল। অন্য লোকটা মনে হল আমাদের কামরাতেই ছিল। যখন ওকে মারধোর করা হচ্ছিল, তখন সেও ওর ওপর সমানে হাত চালিয়েছে। অথচ লোকটা যে ওরই দলের, তাতে সন্দেহ নেই।

ছবি : দেবাশিস দেব

চারিদিকে আনন্দ উৎসব উজ্জ্বল পরিবেশ। ডবল শক্তিশালী নিপ্পো ব্যাটারি লাগান আর পরিবারের সকলের সাথে মিলেমিশে আনন্দে উচ্ছল হোন। টু-ইন-ওয়ান আর খেলনার জন্য নিপ্পো হাই টপ সুপার, ট্রানজিস্টর, টেপ রেকর্ডার আর ক্যালকুলেটরের জন্য নিপ্পো হাইপার আর টর্চের জন্য নিপ্পো স্পেশাল।

National নিপ্পো ব্যাটারি

everest/d85/INL/217 Ben

লোকটি পাইলটের হাতে ছোট একটা পুঁটলি দিয়েছিল...

সেই লোকটি

মঞ্জিল সেন

তেজপুর বিমানবন্দরে প্লেনটা যথাসময়ে নামল। লাউঞ্জে প্রথমেই যা-র উপর সাত্তার-সায়েবের দৃষ্টি পড়ল, সে হল সেই লোকটি। ঢ্যাঙা, গায়ের রঙ তামাটে, মুখে একগাল দাড়ি, চোখে কালো চশমা, পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবি।

এই নিয়ে চারবার তেজপুর এলেন সাত্তার-সায়েব। এক মস্ত কোম্পানির পূর্বাঞ্চল শাখার তিনি সেল্স ম্যানেজার। গোটা পূর্বাঞ্চলে কোম্পানির বিক্রি বাড়াবার অনেকটা দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চেপেছে, আর সেই সূত্রে প্রায়ই তাঁকে সফরে বেরুতে হয়। আজ মালদা, কাল শিলিগুড়ি, পরশু ডিমাপুর, এইভাবে গোটা পূর্বাঞ্চলে তাঁকে ছোটাছুটি করতে হয়।

প্রথমবারই ওই লোকটিকে দেখে তাঁর কেমন জানি সন্দেহ হয়েছিল। সিনেমার ভিলেনের মতো চেহারা, বিশেষ করে চাপ-দাড়ি আর কালো চশমাটা সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। আরও দুটো জিনিস লক্ষ করেছিলেন সাত্তার-সায়েব। লোকটির ওখানে যেন অবাধ গতি, আর ওখানকার কর্মচারীদের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই বেশ খাতির।

ব্যাপারটা কী! গোড়া থেকেই সাত্তার-সায়েবের ভাল লাগেনি। যে-কোনও বিমানবন্দর নিরাপত্তার আওতায় পড়ে, যাত্রী ছাড়া অন্যদের অবাধ প্রবেশের অধিকার নেই। যাঁরা যাত্রীদের নিতে বা বিদায় জানাতে আসেন, তাঁদের টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হয়। এ লোকটির তেমন কোনও উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না, কখনও প্লেনে চাপতেও দেখেননি। একবার ওখান থেকে দমদমের প্লেন ছাড়তে ঘন্টা-দুয়েক দেরি হয়েছিল, সেই দু'ঘন্টা সাত্তার-সায়েবকে লাউঞ্জে বসেই কাটাতে হয়েছিল। তখনই এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, লোকটি কোনও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওখানে আসে না, কিন্তু তাকে ওখানে দেখে কেউ কিছু মনে করে না, বরং হাসিমুখে কথা বলে।

স্মাগলার! যারা ও লাইনে পাকা-পোক্ত, তাদের নাকি সবার সঙ্গে খাতির রাখতে হয়। খাতিরটা অবশ্য মুখের হাসিতে হয় না, তার জন্য অনেক খরচ করতে হয়। সাধু ভাষায় যাকে বলে উৎকোচ। এবং সেই সঙ্গে উপহার বা উপঢৌকন। সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হয়েছিল গতবারের এক ঘটনায়। দমদমের প্লেন ছাড়বার কিছু আগে পাইলটের সঙ্গে ওই লোকটিকে নিরিবিলিতে ফিসফিস করে কথা বলতে তিনি দেখেছিলেন। তারপরই লোকটি পাইলটের হাতে ছোট একটা পুঁটলি দিয়েছিল। সাত্তার-সায়েব অবাক হয়েছিলেন, কেউ ব্যাপারটা লক্ষ করেনি, কিংবা লক্ষ করলেও মুখ খোলেনি। তার একটাই অর্থ হতে পারে, লোকটির চেহারা যতই

ব্যথা উপশমের গুণ তো আপনার হাতে !

মচকানি, পেশীর খিঁচ ধরা, গাঁটের আড়ষ্টতা ও দেহের ব্যথা-বেদনার জন্যে !

আপনার দরদী হাতের পরশ আর আয়োডেক্সের ব্যথা উপশমের শক্তির চমৎকার—আপনার পরিবারজনের দুই-ই দরকার। তাই, আয়োডেক্স সব সময়ে হাতের নাগালেই রাখুন। কারণ, আয়োডেক্সে আছে আয়োডিনের গুণ, যা জখম টিস্যুকে সারিয়ে তোলে, আর আছে মিথাইল স্যালিসিলেট, যা ব্যথা-বেদনার জড়কে নির্মূল করে।

আয়োডেক্স লাগালে দিনে দু'বার, দু'গুণ কাজে চমৎকার

ডাক্তারদের মতে ব্যথা-বেদনা পুরো কমে না যাওয়া অব্দি, আয়োডেক্স দিনে দু'বার ... এবং কমার পরেও আরো কয়েক দিন। ব্যথা হ'ল উপসর্গ মাত্র, বেদনার আসল কারণ জখম টিস্যু।

সুতরাং, আপনার প্রিয়জন যখনই মচকানির, পেশীর খিঁচ ধরা, গাঁটের আড়ষ্টতা বা দেহের ব্যথা-বেদনার চোটে কষ্ট পাবেন, তখনই আপনার হাতের পরশে, আলতো মালিশে লাগান—দিনে দু'বার। আর দেখুন, ওরা কেমন দু'গুণ চটপট সেরে চাঙ্গা হয় আর আপনার দরদী হাতের গুণ গায়।

ELL-1508

SKF এক এসকেএফ উৎপাদন

আয়োডেক্স® – ব্যথা উপশমের গুণের শক্তিতে ভরপুর খাস বাম

সন্দেহজনক হোক না কেন, এই বিমানবন্দরে তার অসীম প্রভাব। হয়তো ওই পুঁটলির মধ্যে চোরাই মাল আছে। পাইলটকে কে আর সন্দেহ করবে ? তার হাত দিয়ে জিনিস পাচার করা যেমন নিরাপদ, তেমন আর কিছুতেই নয়, ধরা পড়ার কোনও আশঙ্কাই নেই। লোকটি যে খুব ধূর্ত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই নিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করেননি সাত্তার-সায়েব। সবার সঙ্গেই যেন লোকটির খাতির, কৌতূহল মেটাতে গিয়ে তিনি নিজেই শেষে টার্গেট না হয়ে পড়েন। স্মাগলারদের কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে কাগজেই তো কত ঘটনা পড়েছেন, যেমন নিষ্ঠুর তেমন হৃদয়হীন হয় ওরা, বিবেকের বালাই নেই।

লাগেজ খালাসের পর তিনি বিমানবন্দরের বাইরে এলেন। তাঁর জন্য কোম্পানি থেকে গাড়ি এসেছিল। উর্দি-পরা ড্রাইভার সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিল। গাড়িতে বসে একবার ভাবলেন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করবেন লোকটির পরিচয় জানে কি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইচ্ছেটাকে দমন করলেন। ড্রাইভার হয়তো লোকটিকে দেখেইনি, অকারণ কৌতূহল জাগিয়ে লাভ কী !

দু'দিন ওখানে কাজকর্ম করে সাত্তার-সায়েব আবার ফেরার প্লেন ধরলেন। লোকটি যথারীতি প্লেন টেক অফ্ করার আগে থেকেই হাজির ছিল, শুধু তাই নয়, এবারও সে পাইলটের হাতে একটা প্যাকেট গুঁজে দিল। আয়তনে এক ফুট বাই আধ ফুটের বড় হবে না, কিন্তু তার মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকার মাল পাচার করা সম্ভব। সোনার বিস্কুট, মাদকদ্রব্য, অনেক কিছুর কথাই সাত্তার-সায়েবের মানসপটে ভেসে উঠল।

কলকাতায় ফিরে আসার পরেও একটা অস্বস্তি তাঁর বুকে খচ্‌খচ্ করে বিঁধতে লাগল। চোখের উপর এমন একটা বে-আইনি কাজ হতে দেখে কোন্ সৎ মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে ! আপিসে তাঁর এক সহকর্মীকে ব্যাপারটা তিনি বলেই ফেললেন। সহকর্মী সব শুনে যেন আঁতকে উঠলেন। বললেন, "চেপে যান মশাই, স্রেফ চোখ বুজে থাকুন। আপনার মশাই কী দায় পড়েছে ! ওখানে সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে, পুলিশ রয়েছে, তারা যদি চোখ বুজে থাকে, আপনি কোন্ দুঃখে খোঁচাতে যাবেন। একেবারে হাপিস করে দেবে মশাই, বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করছেন, আপনার কিসের ঠেকা ! আপনার যা কাজ তা-ই করুন, ওদিকে একেবারে নজর দেবেন না।"

সাত্তার-সায়েবের মন তাতে প্রবোধ মানে না, চোখের সামনে এমন অন্যায়, চোখ বুজে কি থাকা যায় ! লোকটি যে একজন স্মাগলার, এ-বিষয়ে তাঁর মনে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই।

এর পর আরও দু'বার তাঁকে তেজপুর যেতে হল, এবারে কিন্তু ওই লোকটিকে তিনি দেখতে পেলেন না। এদিকে বার-কয়েক ওই ফ্লাইটে যাতায়াত করায় বিমানসেবিকা থেকে পাইলট পর্যন্ত তাঁকে এখন চেনেন, তাঁকে দেখলেই তাঁরা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। এমনকী, তিনি যে সর্বভারতীয় এক কোম্পানির একজন পদস্থ অফিসার, এটাও এখন আর অজানা নেই। তার ফলেই ওই ফ্লাইটের বিমানসেবিকা গীতা সিং তাঁকে ধরেছিলেন একটা ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। উনি নাকি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও ওষুধটা পাননি। তেজপুরেই ওঁর বাড়ি। সাত্তার-সায়েব আপিসে বলে দিয়েছিলেন, এবং তাতে কাজও হয়েছিল। গীতা সিং কৃতজ্ঞতায় কী করবেন, ভেবে না পেয়ে প্রায় জোর করেই সাত্তার-সায়েবকে সেবার নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, খাইয়েওছিলেন খুব।

গীতার কাছেই সাত্তার-সায়েব কথাটা পাড়লেন। ওই লোকটির সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, তবে একটু ঘুরিয়ে, তাঁর নিজের সন্দেহটা প্রচ্ছন্ন রেখে। আগে যতবার এসেছেন ওই ভদ্রলোককে দেখেছেন, এখন আর দেখেন না···।

গীতা সিংয়ের মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল, কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারলেন না। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, "আপনি রাকেশ সোয়েলের কথা বলছেন ! তিনি আর নেই।"

"নেই !" সাত্তার-সায়েব হতবুদ্ধির মতো বললেন, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আপনি যে লাইনে যাতায়াত করেন," গীতা সিং বললেন, "উনি ছিলেন তার একজন পাইলট। খুব আমুদে লোক ছিলেন, মনটাও ছিল দরাজ। আমি তখন সবে এয়ার-হোস্টেসের চাকরিটা পেয়েছি ; প্রথম-প্রথম খুব নার্ভাস লাগত। উনি আমাকে হাসি-ঠাট্টা করে মনে সাহস জোগাতেন, চমৎকার মানুষ ছিলেন। তারপর একদিন দমদম থেকে এখানে ল্যান্ড করার আগে হঠাৎ ওঁর বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। গৌহাটি থেকে টেক অফ্ করার কিছুক্ষণ পরেই ব্যথাটা অনুভব করেন, ক্রমেই সেটা বাড়তে থাকে। উনি বুঝতে পারেন যে, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। বিমানের সব যাত্রীর জীবন-মরণ তাঁর হাতে, এই চিন্তাটাই তখন তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। কাউকে কিছু বলার মতো অবস্থাও ছিল না। কী করে যে ল্যান্ড করেছিলেন, তা নিজেও তিনি জানেন না। যাত্রীরা সব বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু কক্‌পিটে আগুন ধরে সোয়েল-সায়েবের মুখের খানিকটা পুড়ে গিয়েছিল, একটা চোখও জন্মের মতো নষ্ট হয়েছিল, হাসপাতালেই হার্ট অ্যাটাকের ব্যাপারটা ধরা পড়ে, তখন তাঁর জ্ঞান ছিল না। হাসপাতালে অনেকদিন ছিলেন। ওখান থেকে ছাড়া পাবার পর পাইলটের কাজে আর ফিরতে পারেননি, মেডিক্যালি আন্‌ফিট হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তাররা বলেছিলেন, বাকি জীবনটা রেস্টে থাকতে হবে, নইলে যে-কোনও সময় আবার অ্যাটাক হতে পারে। ভলান্টারি রিটায়ার করে এখানেই থেকে গিয়েছিলেন। সরকার থেকে অবশ্য তাঁকে ওই ঘটনার জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছিল, টাকাও পেয়েছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু বিমান-চালনাই ছিল তাঁর প্রাণ, তাই সেরে ওঠার পর রোজ এয়ারপোর্টে আসতেন, সেদিন যে ফ্লাইটের তিনি পাইলট ছিলেন, সেটার ল্যান্ডিং আর টেক্ অফের সময় তিনি না-এসে পারতেন না। আমাদের হাত দিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে পরিচিতদের জন্য মাঝে-মাঝেই এটা-ওটা পাঠাতেন। সবাই তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। দু'মাস আগে আবার একটা অ্যাটাক হয়ে তিনি আমাদের সবার কাছ থেকে চলে গেছেন।"

গীতা সিংয়ের চোখ ছলছল করছিল।

সাত্তার-সায়েব বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন।

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

ঘরর্‌...ঘরর্‌
হল্‌ট্‌ !
আমরা বন্ধু !...গুলি কোরো না !
বন্ধু ?...সাংকেতিক বাক্যটা কী ?
উট ঘেউ ঘেউ...না না, কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেও উট এগিয়ে যায় !
এগিয়ে এসো। এরা কারা ?
বেন কলিশের বন্ধু । বিদেশ থেকে এসেছেন ।
ওদের নিয়ে এগিয়ে এসো।
জানলার মতো গর্তগুলো দেখছ ? আড়ালে নিশ্চয় লোকজন রয়েছে !
জানলা ? লোক থাকে ? বিশ্বাস হয় না !
লোক থাকে এখানে ? অসম্ভব !
দুঃখিত, ম্যাডাম !
লোকজন থাকে বটে !
সামনে দ্যাখো !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
রয়, তুমি কি ঠাট্টা করতে এসেছ ?
রোজার ডিক্সনকে বসিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে সে ট্রান্সফার চেয়েছে । সে যেতে চায় মেলবরো ক্লাবে, যারা কিনা মেলচেস্টার রোভার্সের শত্রুপক্ষ । মেলবরোর সঙ্গে পোর্টডিনের খেলা চলছে…
ওহে মেলবরো, আর যে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি !
এগিয়ে যাও টেড ! ডিনের ডিফেন্স ধসিয়ে দাও ! গোল করো !
যাচ্ছি, বস !
মেলবরোর ম্যানেজার অ্যান্ডি জ্যাকসন এখন মরিয়া !
এই নিয়ে সাতটা খেলায় পাঁচজনকে মূল-স্ট্রাইকার হিসেবে খেলানো হল !
টেড হেজেসের কেরামতিটা দেখা যাক !
টেড এগোচ্ছে !
কিন্তু…
বল তুলে দিল গোলকিপারের হাতে ! ধুত ।
এখনও ২—১ পিছিয়ে আছি !
খেলাশেষের বাঁশি বাজল…
জ্যাকোকে একটা স্ট্রাইকার জোগাড় করতে হবে !
এবারেও তা হলে মেলচেস্টারের কাছে হারব !
দামটা দেবে কে ?
সেই মুহূর্তে… মেলবরোর ড্রেসিং রুমে…
অ্যান্ডি, তোমার স্ট্রাইকার দরকার ?
মানে…
রয়, তুমি কি ঠাট্টা করতে এসেছ ?
ঠাট্টা নয়, ঠিক দাম পেলে রোজার ডিক্সনকে বেচতে পারি !
কী বলছ তুমি !
আমাদের দুই দলের মধ্যে খেলোয়াড় কেনাবেচা চলবে না, এই অলিখিত আইন তোমার জানা নেই ?
জানি । কিন্তু রোজার তা নিয়ে ভাবিত নয় ।

ও থাকতে চায় এই এলাকাতেই ! দুজনকেই আমি বেচতে পারি । নেবে ?
পরদিন সকালের কাগজে…
খেলার খবর
শত্রুপক্ষকে সাহায্য করল রয় রেস
দৈনিক খেলা
রোভার্সের দুই খেলোয়াড় মেলবরোতে চলল
স্টারস্পোর্টস
ডিক্সন আর গাইলস মেলবরোতে যাচ্ছে
মেলচেস্টারের শহরতলিতে রয়ের বাড়ি
রয়, তুমি আইন জানো না ?
দুই ক্লাবের মধ্যে খেলোয়াড় কেনাবেচা চলে না !
এ-কাজ কোরো না !
জানলা থেকে সব দেখছে রয় আর পেনি…
হেলিকপ্টারে যাও ! রাস্তায় বেরোনো ঠিক হবে না !
বেরুতে হবে !
হুউশ ! বাবা চলে গেল !
ভালয়-ভালয় বাড়িতে ফিরলে বাঁচি !
মেলচেস্টার স্টেডিয়ামে…
যাক, ভক্তদের হাত এড়িয়ে পৌঁছে গেছি !
ওই রয় আসছে, মিঃ বার্লো !
নামবামাত্র বোর্ড-রুমে পাঠিয়ে দাও ওকে !
রয় শুনল, স্যাম বার্লো তলব করেছেন ।
ট্রেনিং সেরে বোর্ড মিটিংয়ে যাব
এত তাড়া কেন ?
রয় দেখছি একটুও ঘাবড়ায়নি !
দু'জনকে যে ছাড়া হল, ওদের জায়গায় খেলবে কে ?
সেটাই তো প্রশ্ন !
নতুন খেলোয়াড় কিনতে হলে বিস্তর টাকা চাই !
আগামী সংখ্যায় : স্ট্যামব্রিজের সঙ্গে খেলায় ঘোর বিপর্যয়
রয়ের জীবনে দারুণ সঙ্কট

শীতের রুক্ষতায়
আনে
বসন্তের
মধুর পরশ

চেসমী
গ্লিসারিন সাবান

চেসমী কেমিক্যাল
কলিকাতা।

jaa 2251

তুমি হ্যালির ধূমকেতু জীবনে,
একবারই দেখবে, কিন্তু

রাজকমল
সার্কাস

প্রত্যহ দেখতে পাবে

৮ ডিসেম্বর থেকে পার্ক সার্কাস ময়দানে

আর্মাডাজয়ী সার ফ্রান্সিস ড্রেক

রবীন্দ্রনাথ ঘোষাল

ইংল্যাণ্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের শাসনকাল ইংরেজদের ইতিহাসে একটি সোনায় মোড়া যুগ। সাহিত্যে, শিল্পকলায়, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, সাম্রাজ্য বিস্তারে সেকালের ইংল্যাণ্ডকে কৃতিত্বের শিখরে তুলেছিলেন উইলিয়াম শেকসপিয়র, সার ফিলিপ সিডনি, উইলিয়াম সিসিল এবং সার ওয়াল্টার রলের মতো বিরাট প্রতিভাবান মানুষরা তাঁদের বিস্ময়কর অবদানে।

এলিজাবেথীয় যুগের সঠিক এবং স্বাভাবিক নমুনা হিসাবে বিখ্যাত নৌযোদ্ধা সার ফ্রান্সিস ড্রেকের নাম করা যায়। তাঁর জন্ম ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে ডেভনশায়ার প্রদেশে ট্যাভিস্টকে। বাণিজ্য-জাহাজের খাজাঞ্চির পদ থেকে তিনি উন্নতির পথে উঠে এসেছিলেন মহারানির নৌবহরের সেনাপতির পদে।

প্রোটেস্টাণ্টধর্মী ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সেকালের ক্যাথলিকধর্মী স্পেন। স্পেনের সেনাবাহিনী ছিল সেই দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ। রাজা ফিলিপ স্পেনের নৌবাহিনীকেও সম-শক্তিশালী করে গড়ে তোলার দিকে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, যথেষ্ট সময়, প্রচুর খরচ এবং বেশ যত্নের সাহায্যে। স্পেন এবং ইংল্যাণ্ড এই দুটি দেশের মধ্যে রেষারেষি প্রথমে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছিল, কূটনীতি আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এই দুই দেশের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়া হঠাৎ গরম হতে আরম্ভ করল ওলন্দাজ প্রোটেস্টাণ্টধর্মী নেতা উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জের হত্যায়। ওলন্দাজদের নৌশক্তি এবং ইংরেজদের অর্থ-সাহায্যের দরুন নেদারল্যাণ্ডসের বিদ্রোহীরা অটুট মনোবলের সঙ্গে লড়ে চলেছিল স্পেনের বিরুদ্ধে। রাজা ফিলিপ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করা ছাড়া অন্য পথ নেই।

এদিকে অরেঞ্জের হত্যার প্রতিবাদে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর শোরগোল উঠেছিল। এই সময়ে স্পেনের রাজা ফিলিপও কঠোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন স্পেনের উপকূলের সব বিদেশী জাহাজ দখল করে নিতে। তখন স্পেনের বিভিন্ন বন্দরে বহু ইংরেজ জাহাজ ভিড় করেছিল, দুর্ভিক্ষের কবল থেকে স্পেনকে উদ্ধার করার জন্য বয়ে আনা গমের বোঝা নিয়ে। এদের মধ্যে একটি জাহাজ 'প্রিমরোজ' কোনওমতে পালিয়ে এসেছিল এই খবর নিয়ে। সারা ইংল্যাণ্ডে তখন রাগের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। রানি এলিজাবেথ তক্ষুনি ডেকে পাঠালেন তাঁর দুঃসাহসী নৌযোদ্ধা সার ফ্রান্সিস ড্রেককে। রানি তাঁকে হুকুম দিলেন, সরাসরি স্পেনের পথে পাড়ি দিতে। ড্রেক জানতেন যে, দেরি হলে হয়তো আবার রানি তাঁর মত পালটে ফেলবেন। তাই, একটুও সময় নষ্ট না করে তিনি তাঁর রণতরীর বহর সাজিয়ে পাল তুলে রওনা হলেন স্পেনের দিকে।

উত্তর স্পেনের ভিগো বন্দরে পৌঁছে ড্রেক জানতে পারলেন

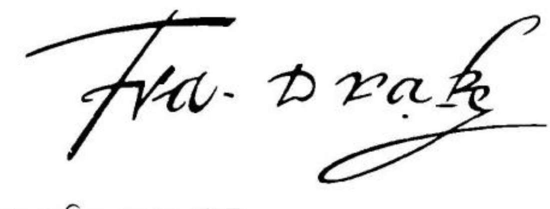

সার ফ্রান্সিস ড্রেকের স্বাক্ষর

যে, আটক জাহাজগুলিকে স্পেনীয়রা ছেড়ে দিয়েছে। তা হলেও দস্যুর মতো ড্রেক শহর লুঠ করে পাড়ি দিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দিকে। স্যান্টো ডোমিঙ্গো'র অদূরে নোঙর ফেলে অল্প সময়ের মধ্যে সে শহরটি দখল করে নিলেন। ড্রেক কিন্তু হতাশ হলেন বেশি কিছু না পেয়ে। এর পরের লক্ষ্য হিসেবে তিনি বেছে নিলেন কার্টাজেনা শহরটিকে। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আঘাত হেনে শহরটি দখল করে নিলেন বটে, কিন্তু সামান্য কিছু মুক্তিপণ ছাড়া বিশেষ কোনও সম্পদ, যা তিনি আশা করেছিলেন, পেলেন না। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ড্রেক ফিরে এলেন ইংল্যাণ্ডের প্লিমথ্ বন্দরে। ওঁর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে।

নেদারল্যাণ্ডসের স্থলযুদ্ধে ইংরেজরা স্পেনীয়দের সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত এবং পর্যুদস্ত হল। এই পরাজয়ের আগুনে ঘি ঢালা হল যখন খবর রটল যে ডিউক অব পারমারের অধীনে স্পেনীয় সৈন্যদল ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে আর রানি এলিজাবেথকে হত্যা করে ক্যাথলিক স্কটদের রানি মেরিকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসাবার তোড়জোড় করা হচ্ছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের এই খবরের ভিত্তিতে অনেক আলোচনার পরে এলিজাবেথের পরামর্শদাতারা মহারানিকে বুঝিয়ে রাজি করালেন রানি মেরির হত্যার আদেশ জারি করতে। সে আদেশ কাজে

সার ফ্রান্সিস ড্রেক

লাগানো হল এবং স্পেনের রাজা ফিলিপ স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযানের সঠিক সময় এসেছে।

ক্যাপ্টেন ড্রেক ইতিমধ্যে একটি দুঃসাহসিক আঘাত হানার পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি বুঝিয়ে রানি এলিজাবেথকে রাজি করিয়ে একটি বেসরকারি নৌবহর সাজিয়ে যত্রতত্র স্পেনীয় জাহাজগুলিকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। পঁচিশে মার্চ তারিখে ড্রেক মোটামুটি রানির অনুমোদন পেলেন তাঁর কাজের ছকের। সমুদ্র-যাত্রার কিছু দিনের মধ্যেই ড্রেকের পঁচিশটি জাহাজের বহর ঝড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এদের সবাইকে একজোট করে পোর্তুগালের উপকূলে আবার বহর সাজানো হয়। এখানে থাকার সময় ড্রেকের লোকরা দুটি বাণিজ্য-জাহাজের কাছ থেকে জানতে পারে যে, স্পেনের ক্যাডিজ বন্দরে তখন অনেক জাহাজের ভিড় হয়েছে।

এ-খবর পেয়ে ড্রেক ক্যাডিজ বন্দরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। দুঃসাহসিক ক্যাপ্টেন ড্রেকের পরিকল্পনার কথা জেনে অধিনায়করা অবাক হলেন। কারণ, ক্যাপ্টেন ড্রেক ঘোষণা করলেন যে, সেই দিনই বিকেলে তাঁরা ক্যাডিজ বন্দরে হানা দেবেন। ক্যাডিজ ছিল খুব সুরক্ষিত শহর, উঁচু পাহাড়ে ঘেরা, সারি-সারি কামানে সাজানো। বন্দরে ঢোকার মুখে ছিল ডুবন্ত পাহাড় আর বালির চড়ার বাধা। এইরকম একটা শক্তিশালী দুর্গে হঠাৎ হানা দেওয়া সব নাবিকদের মতেই ছিল নিতান্ত বোকামি, কিন্তু ড্রেক ভয় কাকে বলে তা জানতেন না। তিনি অসমসাহসে তাঁর জাহাজগুলি সঙ্গে নিয়ে সোজা হামলা চালালেন বন্দরের ভেতর। দু'দিন পরে যখন ড্রেক নিজের বাহিনীসমেত ক্যাডিজ বন্দর ছেড়ে গেলেন, তখন দেখা গেল যে, রাজা ফিলিপের সাধের আর্মাডাবাহিনীর অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। ইংরেজরা উল্লাসে মেতে উঠল এই বলে যে, দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন ড্রেক রাজা ফিলিপের ঘরে ঢুকে তাঁর দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন।

ক্যাডিজ বন্দর অবরোধের সময় ড্রেক জানতে পারলেন যে, অনেক ধনদৌলত নিয়ে স্পেনীয় জাহাজের একটি সারি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের পথে লিসবন বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে স্পেনের শ্রেষ্ঠ নৌসেনাপতি সান্টা ক্রুজের কাছে হাজিরা দিতে। ড্রেকের তর সইছিল না পাহারাদার ছোট নৌবাহিনীটাকে ধ্বংস করে ধনদৌলত ভরা জাহাজগুলি লুঠ করতে। তিনি তাই তড়িঘড়ি পাল তুলে দিলেন মহাসাগরের দিকে। খাড়া পাহাড়ে ঘেরা কেপ সেন্ট ভিন্‌সেন্টে পৌঁছে ড্রেক ঠিক করলেন, এই ঘাঁটিটা আক্রমণ করে অধিকার কায়েম করে নিতে হবে, আর এখান থেকেই স্পেনীয় জাহাগুলিকে ঘায়েল করতে হবে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে ওই ঘাঁটির স্পেনীয়রা আত্মসমর্পণ করল। ড্রেক তখন দুর্গটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন এবং সেই এলাকার ওপর নিজের কর্তৃত্ব জারি করলেন।

এই ঘাঁটিতে থাকার সময় দুর্দান্ত নৌযোদ্ধা ড্রেক চুপ করে বসে থাকলেন না। দ্বীপের চারপাশের মাছ ধরার এলাকায় গোটা-পঞ্চাশেক জাহাজ ডুবিয়ে দিলেন আর ধ্বংস করলেন দামি পিপের বেড় আর লোহার শিকে-ভর্তি আরও গোটা-পঞ্চাশেক জাহাজকে। তারপরে তিনি পাড়ি দিলেন লিসবন বন্দরের দিকে। সেখানে চতুর সাণ্টাক্রুজ কিন্তু ড্রেকের অপমানের ঢোঁপ গেলার কোনও আগ্রহই দেখালেন না। বাধ্য হয়ে ড্রেককে ফিরে যেতে হল তাঁর আঞ্চলিক ঘাঁটি কেপ সেন্ট ভিনসেণ্টে। পথে সারা স্পেনের উপকূলভাগে ড্রেক আতঙ্ক ছড়িয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ নিজের স্বভাবমতো ড্রেক যেন নিখোঁজ হয়ে গেলেন!

প্রায় দু সপ্তাহ বাদে তিনি দেখা দিলেন, অ্যাজোরেসের কাছে। সেখানে তিনি আটকে ফেললেন 'স্যান ফেলিপো' জাহাজটিকে, দশ লক্ষ ডলার মূল্যের সামগ্রীতে বোঝাই ছিল রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নিজস্ব সম্পত্তি এই জাহাজটি। প্রায় তিন মাসের নিরলস চেষ্টার এটাই হল চূড়ান্ত পুরস্কার ড্রেকের কাছে।

ড্রেক স্পেনের আর্মাডার প্রস্তুতিতে দেরি করিয়ে দিতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজে জানতেন যে, আর্মাডাকে শেষ করে দিতে পারেননি। তাই রানি এলিজাবেথের কাছে আর্জি পেশ করলেন তাঁর নৌবহরকে বজায় রাখতে, কিন্তু খেয়ালি মহারানি আদেশ দিলেন সব জাহাজ থেকে কামান আর নাবিকদের নামিয়ে নিতে। সময়ে দেখা গেল যে, ড্রেকের বিচারই ঠিক ছিল। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজদের কাছে খবর এল ফিলিপ তাঁর নৌসেনাপতি সাণ্টাক্রুজকে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তৈরি হবার হুকুম দিয়েছেন। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর রাজকীয় নৌবহরকে সাজিয়ে তৈরি করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় রানি এলিজাবেথের রইল না।

এদিকে যাত্রাপথে আর্মাডা নানারকম অসুবিধার মধ্যে পড়ে। খারাপ আবহাওয়া এবং ধীরগতি কিছু জাহাজের জন্য ওই বিরাট নৌবাহিনী প্রায় মাস-দেড়েকের মতো দেরি করে ফেলে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছতে। এই বাড়তি সময়টা হাতে পাওয়ার জন্যে ইংরেজদের বেশ সুবিধা হয়। শুক্রবার, ২৯ জুলাই, ভাইস অ্যাডমিরাল ড্রেক আর লর্ড অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড প্লিমথ হো-বাউলিং খেলায় মেতেছিলেন। একটি খবরদারি জাহাজ বন্দরে এসে জানায় যে, আর্মাডাকে দেখতে পাওয়া গেছে। প্রবাদ আছে যে, খবরটি শুনে ড্রেক তাঁর স্বভাবসুলভ জবাব দেন, "হাতে আমাদের অনেক সময় আছে, এই বাজিটা শেষ করে গিয়ে স্পেনীয়দের হারিয়ে দেবার।"

যা হোক, ইংরেজরা খুব তাড়াতাড়ি তাদের রণতরী বোঝাই করে বেরিয়ে পড়ল। প্রতিকূল বাতাসের বিরুদ্ধেও তাদের জাহাজ চালানোর দক্ষতা প্রমাণ করে ইংরেজদের নৌবহর জায়গা নিয়ে দাঁড়াল বাঁকা চাঁদের আকারে সাজানো বিরাট স্পেনীয় নৌবহরের পিছনে। ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই, রবিবার, ভোরের আলো ফুটতেই ইংরেজরা অবাক হয়ে গেল স্পেনীয় জাহাজের বিরাট ভিড় দেখে। রণতরীর হিসেবে দুই পক্ষের শক্তি ছিল প্রায় সমান-সমান। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল ইংরেজদের আক্রমণে। তারা একবার এগিয়ে এসে হানা দেয়, আবার পিছিয়ে যায়, তারপর হঠাৎ এসে স্পেনীয় জাহাজগুলিকে খুঁচিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। প্রথম যুদ্ধের শেষ হয় দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ।

পরের দিন ইংরেজরা আবার দেখায় তাদের কলাকৌশল। বাঁকা চাঁদের আকারে সাজানো স্পেনীয় জাহাজগুলিকে পিছন থেকে আক্রমণ করে আবার পিছিয়ে যায়। সেই রাতে দুই পক্ষই নোঙর ফেলে দাঁড়াল পোর্টল্যাণ্ড বিল বলে একটি

স্পেনীয় নৌবহর। আগুনে-জাহাজ ঢুকিয়ে ক্যাপ্টেন ড্রেক যা ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলেন

অন্তরীপের কাছাকাছি। পরের দিন হাওয়ার অসুবিধায় কোনও বড় আকারের লড়াই হল না, যার ফলে যুদ্ধের তৃতীয় দিনেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হতে পারল না। চতুর্থ দিনটি কেটে গেল বিশ্রাম নিয়ে যার-যার বাহিনী গোছগাছ করে নিতে। লর্ড অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড ঠিক করলেন, ইংরেজ বাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করবেন। বৃহস্পতিবার ৪ আগস্ট দুই বিরাট নৌবাহিনী শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আইল অব ওয়াইটের অদূরে। স্পেনীয় অধিনায়করা ঠিক করেছিলেন যে, এখানে তাঁদের রসদ পুরো করে নেবেন। ড্রেকের অধিনায়কত্বে ইংরেজরা সাফল্যের সঙ্গে স্পেনীয় সারি আক্রমণ করে ওদের জাহাজগুলিকে ওখান থেকে হটিয়ে দিল। তাড়া করে ইংরেজরা স্পেনীয় জাহাজদের ইংলিশ চ্যানেলের সরু খাঁড়ির দিকে ঠেলে দিল, যাতে ওরা সুবিধামতো কোনও জায়গায় নোঙর ফেলে না বসতে পারে। ৫ আগস্ট মোটামুটি শান্তিতে কাটল, স্পেনীয় বহরের পেছনে পেছনে চলল কঠোর মনোবলে বলীয়ান ইংরেজ নৌবহর।

পরের দিন আরও পঁয়ত্রিশটি জাহাজ এসে ইংরেজ নৌবহরে যোগ দিল। এই অতিরিক্ত শক্তিতে ইংরেজদের জাহাজের সংখ্যা যেমন একদিকে স্পেনীয়দের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেল, তেমনি জরুরি প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট গোলাবারুদও জুটে গেল ইংরেজ নৌবহরের ভাগ্যে।

রবিবার ৭ আগস্ট স্পেনীয় নৌবহর নোঙর ফেলে দাঁড়াল ফরাসি উপকূলের ক্যাথলিক শহর ক্যালের অদূরে। শৃঙ্খলাবদ্ধ স্পেনীয় নৌবহরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ইংরেজ অধিনায়করা আশ্রয় নিলেন চরম পন্থার—ভয়ঙ্কর আগুনে জাহাজ পাঠিয়ে। এতে বেশ ফল হল। ওই জ্বলন্ত জাহাজগুলি যখন স্পেনীয় নৌবহরের মাঝখান দিয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে চলতে আরম্ভ করল তখন স্পেনীয়রা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তাদের জাহাজগুলি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সাজানো পাহারায় সদাপ্রস্তুত ক্যাপ্টেন ড্রেক তখন বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্পেনীয় নৌবহরের ওপর। সারাদিন তুমুল যুদ্ধের পর গোলাবারুদের অভাবে স্পেনীয় কামানগুলি স্তব্ধ হয়ে গেল। এই একদিনের যুদ্ধে স্পেনের ৬০০ নাবিক মারা যায় এবং আহত হয় ৮০০ জন। এক সপ্তাহের এই ভয়ংকর যুদ্ধে স্পেনীয় আর্মাডা এক লক্ষেরও বেশি কামানের গোলা ছুঁড়েও একটিমাত্র ইংরেজ জাহাজকেও ডোবাতে পারেনি।

এদিকে প্রকৃতিদেবীও যেন স্পেনীয়দের উপর বিরূপ হলেন। বিরাট ঝড় বড় মাপের স্পেনীয় জাহাজগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল উত্তর সমুদ্রে। স্পেনীয়রা প্রথমে ভেবেছিল যে, ভগবান বুঝি তাদের সহায় হলেন, ইংরেজদের রোষের হাত থেকে ওদের বাঁচালেন। স্পেনীয় নৌবহর স্কটল্যাণ্ড এলাকায় ইংরেজ-বাহিনীকে এড়িয়ে উত্তর সাগরে পাড়ি দিল। কিন্তু আর্মাডার দুর্ভাগ্যের তখনও শেষ হয়নি। স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে তারা পড়ল প্রবল ঝড়ের মুখে, যার আঘাত ইংরেজদের রোষের চেয়েও ভয়ংকর। পবিত্র ধর্মযুদ্ধের নামে অনেক আশ্বাস ও ভরসা নিয়ে যতগুলি বিরাট শক্তিশালী জাহাজ স্পেন থেকে রওনা হয়েছিল, তার প্রায় অর্ধেকেরও কম খোঁড়াতে খোঁড়াতে দেশে ফিরল।

সেকালের ইংরেজদের গৌরবের প্রতিমূর্তি সার ফ্রান্সিস ড্রেক জীবনের বাকি সময় কাটালেন কখনও ভালোয়, কখনও মন্দে। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে পোর্টোবেলো বন্দরের অদূরে তিনি তাঁর জাহাজেই মারা গেলেন। নাবিকদের প্রথা অনুসারে সমুদ্রগর্ভে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। মরণ-শয্যায় ড্রেক শপথ নিয়েছিলেন, যদি কখনও তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ইংল্যাণ্ড আবার আক্রান্ত হয়, তিনি ফিরে আসবেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

ভাবিস কী তুই

প্রণব মুখোপাধ্যায়

দেখিস বুঝি রোদ নেমেছে আলোয় মেখে সোনা
জারুল ডালে পাখপাখালির ঘরটি হবে বোনা
হাওয়ার বুকে খড়ের কুটো তাই তো কাড়াকাড়ি
ভাবিস কী তুই আপনভোলা ? যা ফিরে যা বাড়ি ।
আবার কখন দিকবিদিকে হল্লা গেল থেমে,
ঝাউয়ের বনে রক্তরাঙা সুয্যি এল নেমে
সিঁদুর মেঘের ছোপ লেগেছে শিমূলপাতায় ডালে
ভাবিস কী বুই আকাশপাতাল, হাতটি দিয়ে গালে
ভাবিস বুঝি খেয়াল-খেলায় সুর চড়াবি তারে ?
পটের পরে রঙ বুলিয়ে দেখবি বারেবারে ?
আপনমনে মাঠের ধারে শুধুই হেসে কেঁদে,
ভাবিস বুঝি রাখবি সে সব ছন্দ দিয়ে বেঁধে ?
দেখিস যা সব মনে কি তাই মুক্তো হয়ে ঝরে ?
দিন ফুরোল আপনভোলা, যা ফিরে যা ঘরে ।

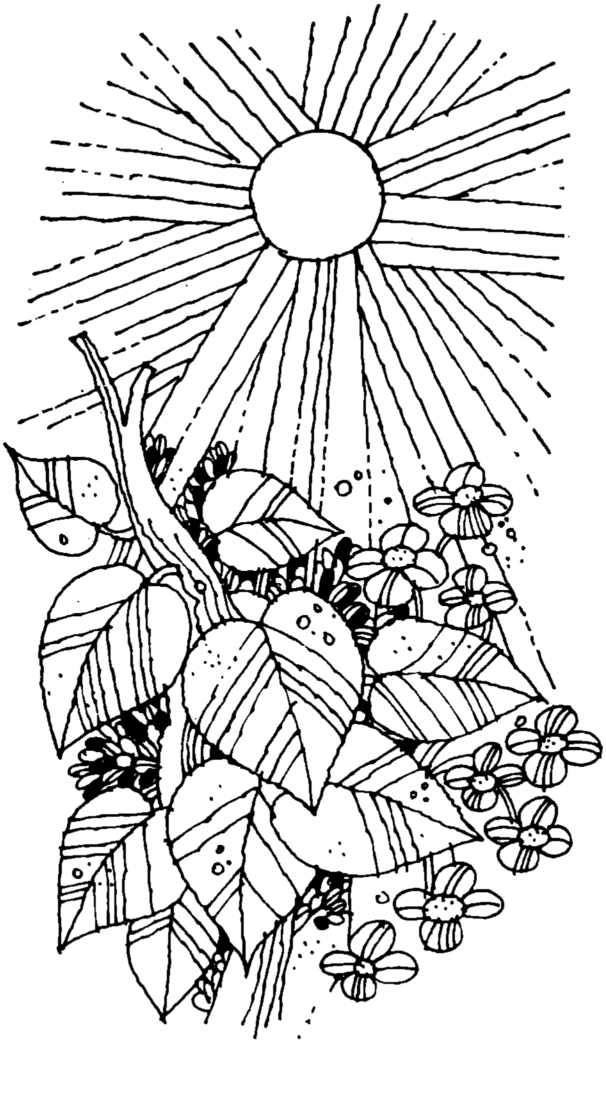

পুষ্পক-প্রাইমারি

রতনতনু ঘাটী

মাত্র ওয়ানে পড়ে চাঁপাফুল সেন,
অঙ্কের ভুল দেখে মিস্ বকলেন ।
“দু'য়ে-দু'য়ে কী ভাবে যে চার পাওয়া যায় ?”
বলতে বললে সে ব্যাগ হাতড়ায় ।

ক্লাস টু'র ফুটফুটে জুঁইফুল চাকি,
বলল সে, “ফ্লাওয়ারের মানে ফুল নাকি ?
শিখেছি যা এতদিন সবটুকু ভুল ?
ইংরেজি ‘ফুল’টাই বাংলায় ফুল ।”

ক্লাস থ্রি'তে পড়ে মিস হেনাফুল দাশ,
ভূগোল কঠিন বড়, সোজা ইতিহাস ।
বলে, “শেরখাঁর ফ্রেণ্ড ইলতুতমিস,
বড় হয়ে এই নিয়ে লিখবে থিসিস ।”

ক্লাস ফোরে পড়ে মিস্ বেলাফুল বোস,
বলে, “বোম্বাই থেকে পুনে তিন ক্রোশ ।”
এই নিয়ে ইস্কুলে কী হাসির ঝড়,
এত জানে বলে ক্লাসে আছে দু' বছর ।

ছবি : দেবাশিস দেব

এদেশের লোক হাতির মাংস খেতে খুব ভালবাসে...

মেরুর পাগলা হাতি

মঞ্জরী লাহিড়ী

নাইরোবিতে খবরের কাগজ খুলে মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে চাষির বউ গোরু চরিয়ে ফেরার পথে লেপার্ডের মুখোমুখি হয়ে একটি বাছুর প্রণামী দিয়ে এসেছে। হায়েনারা মুরগি খেয়ে এক রাত্রেই পোলট্রি ব্যবসার আপদ শান্তি করে দিয়ে গেছে। কিংবা গণ্ডার বা হিপো এসে জমিতে চাষির পাম্পিং সেটটির তদ্বির-তদারক করে তার নাভিশ্বাস তুলে দিয়ে গেছে। কখনও কখনও এমন খবরও বার হয় যে, হাতির দল এসে ভুট্টার খেতে নেচে বেড়াচ্ছে।

আজকাল ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন-এর ছত্রছায়ায় জন্তু-জানোয়ারদের পোয়াবারো। এই কেনিয়ার মতো দেশে যেখানে জমির অনেকটাই ন্যাশনাল পার্ক ইত্যাদির দখলে সেখানে হাতি, গণ্ডার, হিপো, চিতা আহ্লাদে আটখানা হয়ে মাঝে-মাঝেই লোকালয়ে এসে বেশ বজ্জাতি করে। আর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইন-কানুনের প্যাঁচের জন্য গ্রামবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে পারেন না। সেজন্য তাঁরা খুব রেগে রেগে খবরের কাগজের অফিসে চিঠি লেখেন। যখন এইসব দুষ্টবুদ্ধি-জানোয়ারকে একেবারেই সামলানো যায় না তখন তাকে 'রাফ' বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর শিকারিদের খবর পাঠানো হয়।

মেরু ন্যাশনাল পার্কের কথা আগেই বলেছি একবার। মেরু শহর থেকে সামান্য দূরে এই ন্যাশনাল পার্ক। কিছুকাল আগে মেরু ন্যাশনাল পার্কের আশেপাশের গ্রামবাসীরা রেঞ্জারদের কাছে এবং প্রভিন্সিয়াল কমিশনারের কাছে মাঝে-মাঝেই অভিযোগ-বার্তা পাঠাতে লাগলেন, মেরু ন্যাশনাল পার্কের একটি হাতি নাকি একদম হাতি-সুলভ আচরণ করছে না। কর্তৃপক্ষ এর উত্তরে জানালেন, অনুসন্ধান করা হচ্ছে পুরো ব্যাপারটার। অনুসন্ধান কী প্রক্রিয়ায় হল একমাত্র ভগবান ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকারীরাই জানেন, গ্রামবাসীদের বলা হল,

হাতিটির মেজাজ কোনও কারণে একটু গরম। গ্রামবাসীদের আপাতত হাতিটিকে এড়িয়ে চলা উচিত। এতে গ্রামবাসীরা খুবই রেগে গেলেন। কেননা, তাঁদের মতে হাতিটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এদিক-ওদিক থেকে হাতিটির উলটো-পালটা আচরণের খবর এলেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কর্মকর্তারা 'মেজাজ-গরম'-এর সিদ্ধান্তেই অনড় হয়ে রইলেন ক'দিন। কিন্তু ব্যাপার হল, মানুষের মাথার গোলমাল হলেই তাকে সামলানো শক্ত, আর এ তো বুনো হাতি!

এক বুধবার বেলা দশটা নাগাদ অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ যে যার মতো কাজ শুরু করেছে ফুল ফোর্সে, সেই সময় মেরু প্রাইমারি স্কুলের দরোয়ানসাহেব মেরুর এই পাগলা হাতিটিকে স্কুল ভিজিট করতে আসতে দেখে সিনেমার ভাষায় যাকে বলে 'ফ্রিজ শট' ঠিক তাই হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,, বিশাল চেহারা সত্ত্বেও হাতির চলাফেরা খুব নিঃশব্দ। হাতি-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, স্থাণু হয়ে যাওয়ার কারণেই দরোয়ানজি সে-যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান।

স্কুলের ভেতরে ঢুকে হাতিটি স্থির হয়ে দাঁড়াল সামান্যক্ষণ। তিনটি গাড়ি স্কুল বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মধ্যে হেডমাস্টারমশাইয়ের ভক্স ওয়াগন বিট্‌ল গাড়িটি হাতিটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে খুব সম্ভবত গাড়িটির বিচিত্র আকৃতির জন্যই। স্কুলের এই অভূতপূর্ব অতিথিটি প্রথমে গাড়িটার ওপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। পারে না। তারপর সামনের দুটো পা গাড়ির ছাদে তুলে একটি প্রমত্ত হুঙ্কার দেয়। এর পর প্রায় মিনিট দশেক সময় ধরে অজ্ঞাত আক্রোশে শুঁড় ও সামনের পা দুটি দিয়ে গাড়িটাকে যতটা পারে ঠোকাঠুকি করে। গাড়িটির জন্ম হয়েছিল রাস্তায় চলবার জন্য, হাতি দাঁড়াবার প্ল্যাটফর্মের জন্য নয়। সুতরাং দশ মিনিটে গাড়িটিকে আক্ষরিক অর্থে চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দিয়ে হাতি স্কুল-বাড়ি ছেড়ে অন্যদিকে হাঁটা দেয়।

হাতিটি যতক্ষণ গাড়ি নিয়ে খেলা করছিল ততক্ষণ কোনও ভূমিকা এবং রিহার্শাল ছাড়াই ছাত্রদল এবং শিক্ষকরা নিথর নীরবতা পালন করছিলেন। হাতি দৃষ্টির অগোচর হওয়ামাত্রই চারশো বাচ্চার উত্তেজিত চিৎকারে স্কুলবাড়ি কল্লোলিত হয়ে উঠল। সে চিৎকার সুন্দরবনের বাঘকে সাইবেরিয়ায় তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হেডমাস্টারমশাই স্কুলের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একটুও নজর না দিয়ে গাড়ির ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে মর্মে-মর্মে জেনে গেলেন, এই গাড়ি আর যাই করুক, কখনও রাস্তায় চলবে না। তিনজন শিক্ষক একসঙ্গে টেলিফোনটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যিনি লক্ষ্যভেদে সফল হলেন তিনি একে-একে পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, মেরু ন্যাশনাল পার্কের রেঞ্জারদের, প্রভিন্সিয়াল কমিশনারকে, মেরু শহরে কেনিয়া সরকারের যাবতীয় প্রতিনিধিদের খবর দিলেন।

চিরকালই চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। স্কুলের দরোয়ানসাহেব গেট বন্ধ করে প্রচুর খবরের কাগজ, ছেঁড়া কার্টন একগাদা, আধবোতল স্পিরিট এবং একটি দেশলাই নিয়ে দু'জন সহচরসহ দুর্গ-দুয়ার রক্ষা করার দায়িত্ব নিলেন। হাতি এবার ফিরে এলে শোধ নিতে হবে।

মেরুর পাগলা হাতি অবশ্য বসে নেই। বসে থাকার জন্য সে শহরে আসেনি। ইতিমধ্যে শহরে প্রায় আগুন লাগার মতোই হাতির স্কুল ভিজিট ও ভক্সি নিয়ে খেলা করার গল্প রটে গেছে। দোকানপাট, বাড়িঘর সব কিছুরই দরজা-জানলা দ্রুত বন্ধ হচ্ছে। রাস্তা ক্রমেই জনশূন্য। নির্জন রাস্তাঘাট দেখবার জন্য হাতিটা তো শহরে আসেনি। খুব রেগে গিয়ে হাতিটা গোটা-দুয়েক ছোট-ছোট দোকান ভেঙে ফেলল।

সকাল থেকে হাতিটা যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে তাতে তাকে 'রাফ', 'রবার', 'গ্যাংস্টার', 'হুডলাম' যা খুশি তাই বলা যায়। সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব হবে না। অতএব রেঞ্জারসাহেবরা এবং প্রভিন্সিয়াল কমিশনার বন্দুক হাতে রে-রে করে পাগলা হাতি শিকার করতে বেরিয়ে পড়লেন। বেলা দুটো-নাগাদ পাগলা হাতির পাগলামি থামল।

কেনিয়ায় হাতির দাঁত সরকারি সম্পত্তি। আর এদেশের লোক হাতির মাংস খেতে খুব ভালবাসে। সেজন্য সেদিন সন্ধেবেলা প্রভিন্সিয়াল কমিশনারের বাংলোয় সরকারি নেমন্তন্ন। মেরু শহরে সেদিন বেসরকারি ছুটির দিন। সন্ধেবেলা জনতার উদ্দেশে হাতিভোগ।

আমাদের বন্ধু তখন মেরুতে ছিলেন কর্মসূত্রে। তিনি দলবদ্ধভাবে মেরুর অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে তোবড়ানো গাড়ি এবং মৃত হাতিটি দেখে 'এলিফ্যান্ট স্টেক' খাবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নাইরোবিতে এসে সবিস্তার গল্প করে ভদ্রলোক জানালেন, "কিন্তু স্টেকটা খুব এনজয় করতে পারিনি। ভাল করে খাওয়া গেল না, বড্ড ফ্যাট।" হাতির চেহারা দেখে ওই শরীরে ফ্যাট নেই মনে করার কী কারণ আছে আমি আজও বুঝতে পারিনি।

ছবি : দেবাশিস দেব

ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি বিকল ! শিশুদের কে উদ্ধার করবে ?
চলে আসুন ! দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করবে !
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
শোনো…
ওরা কেন উপরে উঠে বাচ্চাদের নামিয়ে আনছে না ?
আগুন দেখে ওরা ঘাবড়ে গেছে !
শিশু-হাসপাতালে আগুন লেগেছে ! টারজান কি বাচ্চাদের বাঁচাবেন, না আকুতকে নিয়ে পালাবেন ?
চলুন, পালাই ! নইলে পুলিশ আপনাকে ধরে জেলে পুরবে !
টারজানের পক্ষে পালানো সম্ভব নয় মিঃ হ্যারিস !
কী করবে তুমি ?
আকুত বেরিয়ে পড়েছে !
ইনিই গোরিলা-চোর !
লর্ড গ্রেস্টোক, আমরা আপনাকে গ্রেফতার করছি ।
কিন্তু ওঁকে গ্রেফতার করলে শিশুদের কে বাঁচাবে ?
আরে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মানুষখেকো মাছ পিরান্হা

জয় সেনগুপ্ত

ম্যান-ইটার—এই ভয়ঙ্কর আখ্যা খুব কম সংখ্যক প্রাণীকেই দেওয়া যায়। এদের মধ্যে সাদা হাঙর আছে, যারা সাঁতরে যাওয়া মানুষ অথবা ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিকদের নিমেষের মধ্যে হত্যা করে। বাঘ, সিংহ এবং কুমিরেরও আহার্যে পরিণত হয় মানুষ। কিন্তু সাউথ আমেরিকার আমাজনের ছোট মাছ 'পিরান্হার' মতো এত হিংস্র প্রাণী বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই।

প্রথম দর্শনে কিন্তু পিরান্হাকে আদপেই হিংস্র বলে মনে হবে না। আকারে এই মাছ বেশ ছোট হয়। দু'ফুট লম্বা পিরান্হা খুব কমই দেখা গেছে। চ্যাপ্টা গোছের এই মাছটি সিলভার ডলার মাছের মতো দেখতে, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে মাছ দুটির মধ্যে আকাশপাতাল তফাত।

পিরন্হার ছোট্ট শরীরের পিঠ এবং পেটের কাছটা নৌকোর তলার মতো। ছোট ছোট আঁশ, লেজের পাখনা চওড়া এবং ব্লেডের মতো। দৈহিক গঠন থেকেই বোঝা যায় যে, এরা খুব চটপটে।

পিরান্হার মাথা খুব বড়। মাথার পেছন দিকটা মোটা হাড় দিয়ে বর্মের মতো ঢাকা। বড়-বড় গোল চোখ কখনও-কখনও রক্তের মতো লাল হয়। এদের ত্রিভুজাকৃতি দাঁতের ধার ব্লেডের মতো। এদের কামড়ের মধ্যে কোনও কিছু পড়লে তার অবস্থা হবে মাখনের ভেতর দিয়ে ছুরি চালানোর মতো। এক-একটা কামড়ের সঙ্গে বেশ কিছুটা মাংস উঠে আসবে।

পিরান্হা নামটা এসেছে টুপি-গুয়ারানি রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে, যার মানে টুথফিশ। স্প্যানিশ ভাষাভাষী দেশগুলিতে এটিকে ক্যারিব অথবা ক্যানিব্‌ল্ ফিশও বলা হয়।

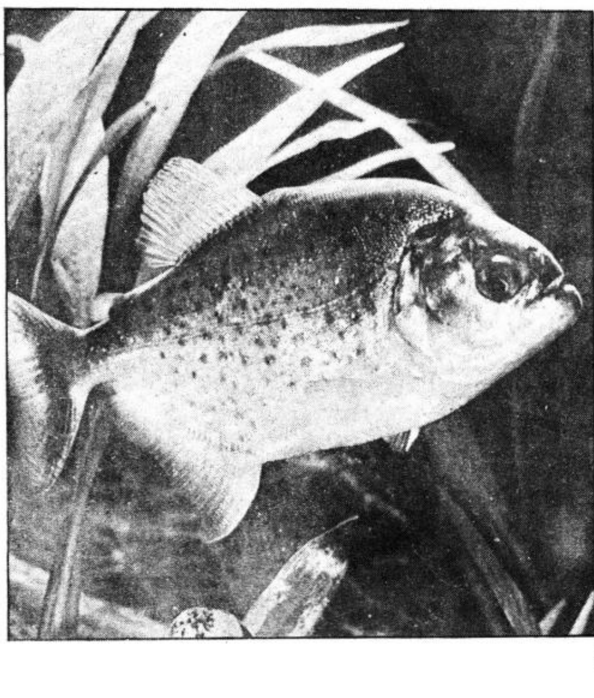

পিরান্হার ভয়ঙ্কর কামড় দেখবার অভিজ্ঞতা একবার হয়েছিল এমিলি এবং পার ওলা ডলেয়ারের। ঘটনাটা এইরকম :

একদিন ব্রাজিলের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মানাউসয়ে মাছ ধরার জন্য একজন গাইড ভাড়া করলেন এমিলি এবং পার ওলা ডলেয়ার। শহর ত্যাগ করবার এক ঘণ্টা পর জর্জ কর্দমাক্ত আমাজন থেকে দূরে একটা ক্ষুদ্র উপসাগরের মধ্যে এসে বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। তারপর একটা হুকের মাথায় কাঁচা মাংস বেঁধে সেটা ঝুলিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কিছু একটা এসে মাংসটা খাবার চেষ্টা করল। হুকটা দুলে উঠল এবং জর্জ হুক ধরে পেছন দিকে এক টান মারতেই ত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা একটা মাছ এসে বোটের ওপর পড়ল। রেড পিরান্হা, জর্জ সাবধান করে দিল, "হাত, পা সাবধান।"

বোটের ওপর এসে পড়া এক ঝলক সূর্যের আলোয় পিরান্হার সিঁদুর-রঙের পেট চকচক করছিল। যে-কোনও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাছের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল এটাকে। হিংস্র মাছটা চোয়াল বারবার খুলছিল আর বন্ধ করছিল। এটার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য জর্জ একটা দাঁড় হাতে নিয়ে প্রস্তুত ছিল, কারণ হুকটা মাছটার মুখ থেকে আলগা হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে কাঠের দাঁড় থেকে অর্ধবৃত্তাকার এক টুকরো কাঠ কেটে নিয়ে মাছটা জলে লাফিয়ে পড়ল। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পিরান্হা-অধ্যুষিত দেশগুলিতে জেলেদের কেন হাতের এবং পায়ের আঙুল খোয়াতে হয় প্রায়ই।

পিরান্হারা প্রায়ই দল বেঁধে খাবারের সন্ধানে যায়। মাঝে-মাঝে এক-একটা ঝাঁকে কয়েকশো পিরান্হা থাকে।

একজন ব্রাজিলিয়ান কাউবয় পঞ্চান্ন কিলোগ্রাম ওজনের একটা ক্যাপিবারাকে আহত করেছিল। ক্যাপিবারা পৃথিবীর বৃহত্তম তীক্ষ্নদন্ত প্রাণী, অর্থাৎ ইঁদুরজাতীয় প্রাণী। এই ক্যাপিবারার মাংস আমাজনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে খুব প্রিয়। আহত ক্যাপিবারাটি লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গিয়ে কাছাকাছি একটা লেকের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। কাউবয়টি জানায় যে, লেকের জল টকটকে লাল হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাপিবারাটির হাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। এই ঘটনার পেছনে যে পিরান্হাদের অবদান রয়েছে, এটা বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।

ব্রাজিলে এক ভদ্রলোক খচ্চরের পিঠে চেপে ছোট একটা নদী পার হচ্ছিলেন। পিরান্হার আক্রমণে তাঁর চেহারা মুহূর্তের মধ্যে একটা কঙ্কালে পরিণত হয়।

১৯১৪ সালে থিওডোর রুজভেল্ট এই ঘটনাটির উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পিরান্হা একটা ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য পিরান্হার মানুষ খাওয়ার ঘটনার সংখ্যা খুব কম। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে মানাউস থেকে দুশো কিলোমিটার পূর্বে খেয়া-পথ পার হওয়ার সময় যাত্রী-বোঝাই একটা বাস পিরান্হা-অধ্যুষিত উরুবু নদীতে পড়ে যায়। ন' ঘণ্টা পরে উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছবার পরে দেখা যায়, আটত্রিশ জন যাত্রী মারা গিয়েছিল। তাদের প্রায় সবাইকেই কঙ্কালে পরিণত করেছে এই মাছগুলো।

এইসব ঘটনা সত্ত্বেও অনেক বিশেষজ্ঞের মতে পিরান্হার

প্রতি মানুষের এই আতঙ্ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত। তাঁরা বলেন যে, যে-সব নদীতে জেলেরা ডজন-ডজন পিরান্‌হা ধরে, সে-সব নদীতে স্থানীয় অধিবাসীরা সাঁতার কাটে।

রেড ইণ্ডিয়ানরা আসলে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় হুলওয়ালা সামুদ্রিক মাছ—অ্যানাকোণ্ডা এবং ক্যানডিরুকে। ক্যানডিরু একরকম পরগাছা মাছ, যেগুলো মানুষের দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বাসা বাঁধে। এগুলোকে বার করার জন্যে অনেক সময় অপারেশনেরও দরকার হয়। গরমকালে যখন অক্সবোওয়ের ক্ষুদ্র উপসাগর, লেক বা পুকুর শুকিয়ে যায়, তখন সেই অগভীর জলে পিরান্‌হা খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এরা এইসময় প্রায়ই গবাদি পশুর ওপর আক্রমণ চালায়। অগভীর জলের ওপর দিয়ে চলার সময় গোরুর বাঁট অথবা লেজের প্রান্ত কামড়ে ধরে এরা সাঁতরিয়ে চলে। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ম্যাটো গ্রসো স্টেটে একজনের বারোশো গবাদি পশুর অঙ্গহানি হয়েছিল পিরান্‌হার আক্রমণে। ফলে গবাদি পশুগুলিকে মেরে ফেলতে হয়।

রক্তের গন্ধ পিরান্‌হাদের পাগল করে দেয় এবং সেই গন্ধ অনুসরণ করে এরা প্রচণ্ড গতিতে মুখ হাঁ করে লক্ষ্যবস্তুর কাছে পৌঁছয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পিরান্‌হা প্রজাতির সংখ্যা কুড়িরও বেশি।

স্ত্রী-পিরান্‌হারা তীরে এসে জলজ উদ্ভিদের মধ্যে কয়েকশো ডিম পাড়ে। পুরুষ-পিরান্‌হারা তা দিয়ে ডিমগুলিকে ফোটায়, তারপর আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। ডিম ফেটে বাচ্চা বেরিয়ে আসার পর কিছুদিন তাদের ওই জলজ উদ্ভিদের মধ্যে কাটাতে হয়। বাবা-পিরান্‌হারা বাচ্চাদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচায়।

পিরান্‌হা তার নিজের আয়তনের থেকে অনেক গুণ বড় প্রাণীকেও আক্রমণ করে যদি প্রাণীটি আহত হয় অথবা তার হাবভাব একটি আগন্তুকের মতো হয়। শিকারটি যদি একটি বড় মাছ হয়, তা হলে পিরান্‌হারা তার লেজ কেটে দিয়ে সেটিকে নিশ্চল করে দেয়। পিরান্‌হারা যখন ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে, তখন পাখিরাও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না। বুনো হাঁসেরা জলের ঠিক ওপর দিয়ে উড়ে যায়, ওড়ার সময় মাঝেমধ্যে ওদের কবলে পড়ে।

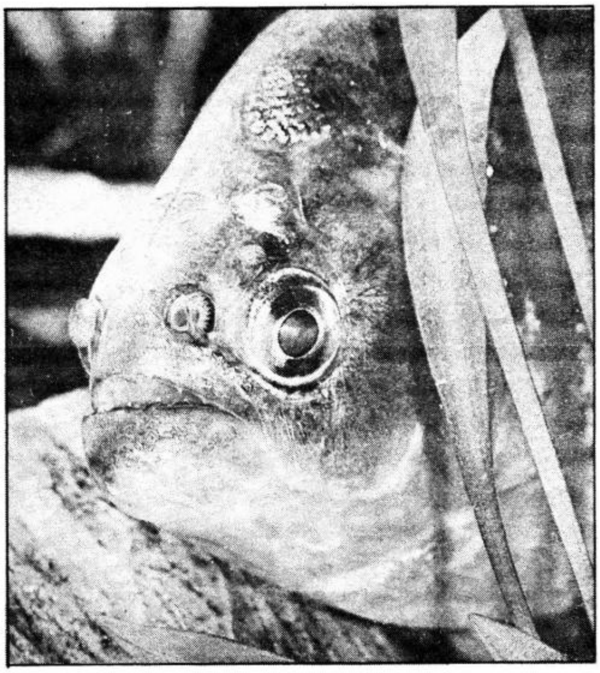

রেড ইণ্ডিয়ানরা জলের মধ্যে টিমবো আঙুর গাছের বিষাক্ত ছালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে পিরান্‌হা ধরে, তারপর সেগুলো গরম কয়লার ওপর ধরে রোস্ট করে খায়। খাওয়ার পরে পিরান্‌হার চোয়ালগুলি আঙুর এবং আঙুর গাছের ছাল কাটার জন্য কাঁচি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কখনও-কখনও তাদের দাঁতগুলো তীরের ফলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

একবার একজন রেড ইণ্ডিয়ান একটা লেকের তীরে বসে মুর্গির মাংস ছাড়াচ্ছিল আর নাড়িভুঁড়িগুলো ছুঁড়ে জলে ফেলছিল। তারপর হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলার জন্যে জলে হাত ডুবিয়েই প্রচণ্ড চিৎকার করে হাত তুলে নেয়। দেখা গেল তার একটা আঙুল কেটে নিয়েছে পিরান্‌হা।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন মিশনারি বলেন, গ্রামবাসীরা বড্ড বেশি দার্শনিক। তাদের মতে দোষ ওই রেড ইণ্ডিয়ানেরই, পিরান্‌হার নয়। বোকার মতো জলের মধ্যে হাত ডোবানো ঠিক হয়নি।

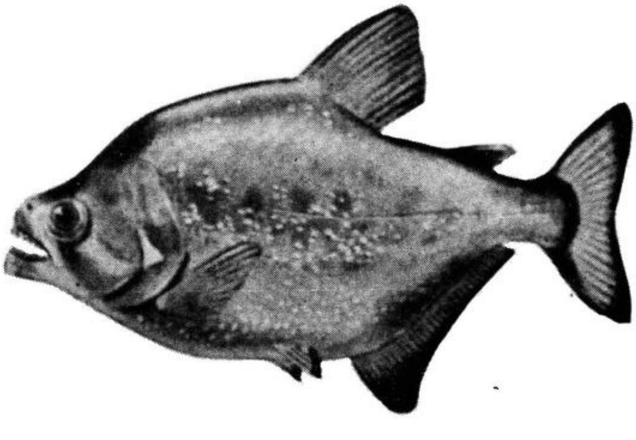

যেমন সহজ জোগাড় করা ! তেমনি মজার যোগ দেওয়া !

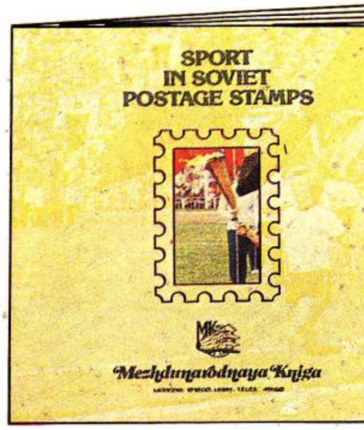

বিনামূল্যে ! রঙচঙে ডাকটিকিটের পুস্তিকা তোমাদের ক্লাবের ক্যাপ্টেনের জন্য !

তোমাদের নিজস্ব ডাকটিকিট সংগ্রহ তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলো, আর গড়ে তোলো সংগ্রাহকদের ক্লাব !

তোমরা ক'জন মিলে ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের একটা ক্লাব গড়ে দেখো, কী মজা ! ডুপ্লিকেট ডাকটিকিট বন্ধুদের সঙ্গে বদল ক'রে কাজটা শুরু করো । ডাকটিকিটে আগ্রহী এমন আরও বন্ধু জোগাড় করো স্কুল আর পাড়া থেকে । দেখবে, খুব তাড়াতাড়িই ক্লাব গঠনের মতো যথেষ্ট বন্ধু পেয়ে গেছো । ক্লাব গঠন ক'রেই একজনকে ক্যাপ্টেন ক'রে দাও, তারপরে তার নাম ও পরিচয় পাঠাও চিনার-কে । এতে আমরা তাকে তার সংগ্রহের জন্য বিনা পয়সায় একটি পুস্তিকা পাঠাতে পারবো । (সূত্র— সবচেয়ে বেশি ডাকটিকিট যার সংগ্রহে, তাকেই ক্যাপ্টেন করতে পারো) ।

প্রত্যেক সদস্যের জন্য "পাওয়ার টাকা দেওয়ার" সুযোগ

ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে তোমাকেও দুর্দান্ত সংগ্রহের নিদর্শন দেখাতে হবে । এখন থেকেই সংগ্রহ বাড়িয়ে যেতে থাকলে দেখবে এটা কত তাড়াতাড়ি সহজে হয়ে যায় । যেটা তোমাকে করতে হবে তা হলো আগে ঠিক ক'রে নেওয়া যে, কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর ডাকটিকিট তোমার নেই । পাশের কুপনটি ভর্তি ক'রে চিনারের কাছে পাঠিয়ে দাও । **যদি আগাম টাকা দাও**— ন্যূনতম ৫০ টাকা অর্ডার + ৭ টাকা ডাকখরচ লাগবে । ১০০ টাকা বা তার বেশির অর্ডারের জন্য ডাকখরচ দিতে হবে না । **যদি ভি পি পি-তে অর্ডার দাও**— ন্যূনতম ১০০ টাকার অর্ডার + ৭ টাকা ডাকখরচ । সবরকম অর্ডারেই ডাকটিকিটের দামের ওপর ১০% বিক্রয় কর লাগবে । ভি পি পি অর্ডারের ক্ষেত্রে তোমরা বাবা-মার অনুমতি নিয়ে নেবে ।

কে এই চিনার ?

—ভারতের সর্ববৃহৎ ডাকটিকিট আমদানি ও রপ্তানিকারী

—ভারতে ইউ এস এস আর-এর ডাকটিকিটের একমাত্র 'ভারতীয়' ডিস্ট্রিবিউটর

—প্রকৃত সংগ্রাহকদের জন্য নতুন নতুন ডাকটিকিট সংগ্রহ করে এমন এক প্রতিষ্ঠান ।

তাড়াতাড়ি ! আজই তোমার কুপন পাঠাও

যে-প্যাকেটগুলি চাও, তাতে গোল দাগ দাও

বিষয়	ডাকটিকিট			
	১০	২৫	৫০	১০০
মহাকাশ	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
খেলাধূলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
পরিবহণ	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
শিল্পকলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
ফুল	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	—
জীবজন্তু	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	—
নৌ /সমুদ্র জীবন	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩০·০০*
পেন্টিং	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	—
লেনিন	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	২৫·০০**
উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল	—	—	—	৩৫·০০
মস্কো	—	—	—	৩০·০০
সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্য	—	—	৩০·০০	***
শান্তি ও মৈত্রী	—	৮·০০	—	২৫·০০
অক্টোবর বিপ্লব	৩·৭৫	—	—	২৫·০০
নানারকম	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	২৫·০০

*৯০টি ডাকটিকিট **৮৫টি ডাক টিকিট ***৫৩টি ডাকটিকিট

নাম ______________________ বয়স ________

ঠিকানা ______________________

অভিভাবকের স্বাক্ষর ______________________

কুপনটি ইংরেজিতে ভর্তি করতে হবে

চিনার—ক্রমবর্ধমান সংগ্রাহকদের জন্য সবচেয়ে বেশি ডাকটিকিট আমদানি করে— প্রতিদিন ।

চিনার এক্সপোর্টস প্রাঃ লিঃ

রেজি অফিসঃ
১০১এ, সূর্যকিরণ, কস্তুরবা
গান্ধী মার্গ, নয়াদিল্লি— ১১০০০১

ডাকটিকিট— যার সংগ্রহ তোমাদের সঙ্গেই বেড়ে ওঠে

বড়গল্প

অভ্র বনাম শুভ্র

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

শুনেই মেজাজটা সপ্তমে চড়ে গেল!

আবার সেই রসগোল্লা! এবং বলা বাহুল্য, এ রসগোল্লা কাচের মতো স্বচ্ছ চিনির রসে ভাসা ছানার মণ্ড নয়, এ হল শুভ্রদীপের অঙ্কের খাতায় পরীক্ষকের সযত্নে পরিবেশিত বিশেষ একটি বস্তু, যা মাসের শেষে বাঁধা-বরাদ্দের মতো প্রতি পরীক্ষাতেই সে পেয়ে আসছে। অথচ অফিসের ছুটি নিয়ে মাসখানেক কী খাটুনিটাই না খেটেছি ওর পিছনে! হাজারের সংখ্যাগুলোকে এককে নামিয়ে, কয়লার ওয়াগনকে টফি-লজেন্সে পরিণত করে যত সহজে পারা যায় বোঝাবার চেষ্টা করেছি। বোঝেওনি যে তা নয়, কিন্তু ফলটা হল কী? রেজাল্টের বেলায় সেই তো একই হাল!

অর্থাৎ রসগোল্লা!

বাজারের থলিটা অভ্রর হাতে দিয়ে বললাম, "শুভ্র কোথায়?"

"কী জানি! সারা বিকেল খেলে এসে এখন হয়তো পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে!" ঠোঁট উলটে বেশ ভারিক্কি চালেই বলল শুভ্রর দাদা অভ্র।

"রেজাল্টটা?"

"রেজাল্ট তো লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু মুখে বলছে দেয়নি।"

"দিয়েছে, তুই ঠিক জানিস?"

গলায় জোর দিয়ে অভ্র বলল, "দিয়েছে, দিয়েছে। বুবাই বলল, সঙ্গে একখানা গার্জেনকে চিঠিও দিয়েছে।"

"চিঠি আবার কিসের ?"

"তা জানি না। বোধহয় ওই ফেল করার ব্যাপারেই।"

"কিন্তু বুবাইয়ের তো অন্য সেকশান ?"

"তাতে হল কী ! যেদিন রেজাল্ট বেরোয়, সব সেকশানেই একসঙ্গে বেরোয়। তা ছাড়া স্কুল থেকে ফেরার সময় ওর মুখটা যদি দেখতে !"

রেজাল্টের চেয়ে চিঠির ব্যাপারটাই আমাকে চিন্তিত করে তুলল বেশি করে। ছেলের টি· সি· দেবার ব্যবস্থা করেছে কি না কে জানে। একটু চুপ থেকে বললাম, "যদি দিয়ে থাকে, আছে নিশ্চয়ই। দ্যাখ্ না ওর পড়ার টেবিলে, কি বই খাতার ভেতরে !"

"সব দেখেছি বাবা, কোথাও পাইনি। দু'বারের পর তিনবার জিজ্ঞেস করতেই তেড়ে-মেড়ে উঠল। তারপর বিকেলে কিছু না খেয়েই বেরিয়ে গেল খেলতে।"

"এখন কী করছে ?"

"এখন কী করছে জানি না।"

"আচ্ছা, তুই যা। আমি নীচে থেকে একটা কাজ সেরে ওপরে যাচ্ছি। মাকে গিয়ে বল গে।"

আমার কথা কেড়ে নিয়ে অভ্র বলল, "তুমি তো এত দেরি করে ফেরো না, আজ এত দেরি হচ্ছে দেখে মা অনেকক্ষণ থেকে ছটফট করছে।"

"করুক !" মনের ঝাঁজটা যেন বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে, "মাকে গিয়ে বলগে, আমার চা'টা এখানে দিয়ে যেতে। আমার একটা জরুরি কাজ আছে, অফিসের ফাইল বাড়ি নিয়ে আসতে হয়েছে। তোমার ভাইয়ের জন্যে যে-ক'দিন অফিস কামাই করেছি, সব কাজ তো জড়ো হয়ে ছিল এতদিন, শেষ করতে হবে না ? এখন ওপরে উঠলে আর কাজ হবে না ! গুরুদেব কী করছেন ?"

"উনি এখন আহ্নিক করতে বসেছেন। আর, মা নারকেল কুরছে গুরুদেবের জলখাবারের জন্যে। মা তো উঠতে পারবে না, যতক্ষণ না জলখাবারের আয়োজন শেষ হয়।"

এই এক ঝঞ্ঝাট হয়েছে আমার ! আজ দিন পাঁচেক হল, অভ্রর মামার বাড়ির তরফের সেই কে এক গুরুদেব এসে হাজির হয়েছেন আমাদের বাড়িতে। বাপের বাড়িতে গিয়ে কবে নাকি অভ্রর মা কথায়-কথায় একবার দীক্ষা নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, লতায়-পাতায় সে-খবর একদিন পৌঁছে গেল গুরুদেবের কানে, আর মানুষের এই ইচ্ছেকে অপূর্ণ রাখাকেও পাপ জ্ঞান করে স্বয়ং তিনি এসে হাজির হয়েছেন অন্ধজনে আলো দিতে। এদিকে আমি যে ক্রমে কোন্ অন্ধকারের অতলবাসী হতে চলেছি, তার খোঁজ রাখবার কেউ নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে কুলগুরুর কথাটা একবার তুলেছিলাম, তাঁর বিনা অনুমতিতে যে আর কারও কাছে দীক্ষা নিতে নেই, সে-কথাটাও জানিয়েছি অনেকবার, কিন্তু তাতে বাক্-বিতণ্ডাই হয়েছে, কাজ কিছু হয়নি। ঈশ্বরের নির্দেশ আছে বলেই নাকি অতদূর থেকে বুড়ো মানুষটা নিজে থেকে ছুটে এসেছেন এতটা পথ ! অগত্যা সেটাকেই বেদবাক্য মনে করে চুপ করে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনও পথ রইল না।

সর্বসাকুল্যে আড়াইখানা ঘর নিয়ে আমার বাস। এখন সেই আড়াইখানা ঘরের একখানা ছেড়ে দিতে হয়েছে গুরুদেবকে। চিরকাল ভাল-মন্দ খাওয়ার শরীর গুরুদেবের। আমার এখানে এসে যদি শরীরের চামড়া তাঁর আঁচড় পরিমাণও কুঁচকে যায়, তা হলে সে-লজ্জা ঢাকতে অভ্রর মাকে হয়তো আত্মঘাতী হতে হবে। তাই ভোরবেলায় ছেলেদের জন্যে আনি মাদার ডেয়ারির প্যাকেট, আর দেড় মাইল পথ ভেঙে গুরুদেবের জন্যে আনি চোখের সামনে দোহানো গোরুর দুধ পাঁচপো। ক্ষীর হবে, ছানা হবে। ক'দিনের জন্যে এটুকু কষ্ট করতেই হবে। হাজার হলেও অভ্রর মামার বাড়ির তরফের গুরুদেব, বিশেষ করে তিনি যখন নিজে থেকে অনুগ্রহ করে এসেছেন পায়ের ধুলো দিতে। অনেক পুন্যি করলে নাকি ভাগ্যে এমনটা মেলে।

বাজারের থলিটা অভ্র নিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ওপর থেকে দ্রুত পায়ে নেমে এলেন অভ্রর মা। আমার ঠোঁট নড়ার আগেই হন্তদন্ত হয়ে বলে উঠলেন, "কই, খেজুর আনোনি তো ? আর, অফিসে বেরোবার মুখে অত করে বলে দিলাম সামান্য কিছু কিশমিশ আর পেস্তা-বাদাম আনতে, গুরুদেব নিজের মুখে একটু পায়েস খেতে চেয়েছেন, তাও ভুলে গেছ ? তোমার কী হয়েছে বলো তো ?"

মাথায় তখন আমার শুভ্র ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই অভ্রর মায়ের প্রশ্নের জবাবের ধার দিয়ে না গিয়ে বললাম, "শুভ্র রেজাল্ট কী করেছে, শুনেছ ?"

"ও শুনে আর আমি কী করব !" অভ্রর মায়ের গলায় যেন একটু ঝাঁজ দেখা দিল, "তোমার ছেলে, তুমি বোঝোগে যাও। তোমাকে যেগুলো বলব, তা তো আর শুনবে না। ঠাকুর-দেবতার ওপর একটু বিশ্বাস রাখবে না তো ছেলের ভাল হবে কী করে ! গুরুদেব নিজে বললেন, ওর গ্রহ খারাপ চলেছে, যাগযজ্ঞ করে একটা সরস্বতী-কবচ করিয়ে দেবেন, যৎসামান্য শ'আড়াই টাকার মতো খরচা, তা শুনেই তোমার মুখ ভার ! যাকগে, যা ভাল বোঝো করো। এখন আমি যাই, গুরুদেবের হয়তো আহ্নিক সারা হয়ে গেছে। ওঁকে জলখাবারটা দিয়েই তোমার চা'টা করে আনছি। ততক্ষণ তুমি এক কাজ করো দিকিনি, বাজার থেকে একটু পেস্তা-বাদাম এনে দাও ! দেখো, যেন পোকা-ধরা কি পচা না হয়। একটু ভাল দোকান থেকে নিও।"

অভ্রর মায়ের কথাগুলো আমার সারা শরীরে যেন জলবিছুটি মাখিয়ে দিল। কিন্তু উপায় নেই কিছু বলার। হাইপারটেনশানের রুগি আমি, সুতরাং বাদ-প্রতিবাদ যত এড়ানো যায়, ততই মঙ্গল। আমার পক্ষে বলাটা অবশ্য ভুল, অভ্র-শুভ্রর পক্ষে। ওরা যে এখনও নাবালক। তাই হুকুম তামিল করতে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু মনটা আমার খুবই বিচলিত, বিক্ষিপ্ত। একে তো বাড়ি ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে অভ্র যা শোনাল, তাতেই মনটা উত্তেজিত, তার ওপর ওদের মায়ের কথাগুলো যেন আমার সমস্ত মনটাকে দিল বিষিয়ে। প্রাইভেট টিউটর রাখার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার বার-পাঁচেক হয়ে গেছে, স্কুলের পড়াশুনোর ওপর ভরসাও আমি আর তিলমাত্র করি না, যদ্দিন বুঝিনি, মায়ের তত্ত্বাবধানে রেখেও দেখেছি। কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু এখন ? এখন আমার বেলাতেও তো সেই একই ফল। গোল্লা-রসগোল্লার ছড়াছড়ি। ভাল পড়াই বলে এতদিন যে অহঙ্কার মনের মধ্যে

গোপনে লালন করে চলেছিলাম, অভ্রর কাছ থেকে খবরটা শোনা মাত্র মুহূর্তেই তা যেন চূর্ণ হয়ে গেল।

মাথার মধ্যে হাজার রকম চিন্তার কাটাকুটি নিয়ে বাড়ি ফিরতেই অভ্রর মায়ের গলা শোনা গেল, "ওই যা ! দেখেছ কী কাণ্ড ! বাজারে গেলে, আর ফলটল কিছু আনতে বললাম না ? কাল দুপুরে যে গুরুদেবের কিছু খাওয়া হবে না ! যাকগে, কাল অফিস যাবার আগে একবার দশ মিনিটের জন্যে বেরিয়ে একটু ফল-পাকুড় এনে দিও, কেমন ? ক'টা দিন বই তো নয়, সামনের পূর্ণিমায় দীক্ষা দিয়েই উনি চলে যাবেন।"

সামনের পূর্ণিমা ? সে তো অনেক দেরি ! আজ তো সবে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী ! যথাসম্ভব নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টায় অফিসের ফাইলটা টেনে নিলাম কোলের কাছে। ভুলেই গেলাম অফিস থেকে ফিরে এখনও চা পাইনি। কিন্তু কাজেও মন বসাতে পারলাম না কিছুতেই। শুভ্রর ভবিষ্যৎ-ছবিটা যেন তাড়া করে ফিরতে লাগল ক্রমাগত। স্কুল থেকে টি· সি· দিলে করবটা কী ? পর পর দু'বছর ফেল করলে স্কুলে রাখবে না। আর, অন্য স্কুলে নিয়ে গেলে তো প্রথমেই কমপক্ষে তিন ক্লাস নামিয়ে দেবে ! অগত্যা ফাইল বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম কতক্ষণ।

একসময় আবার একছুটে ওপর থেকে নেমে এল অভ্র। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "শুভ্র মটকা মেরে শুয়ে আছে বাবা, কিছুতেই উঠছে না। ডাকলাম, অত করে বললাম, বাবা ডাকছে, ওঠ্। উঠছে না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যেন তেড়ে আসতে চায়।"

"কোথায় শুয়ে আছে, কোথায় ?"

"গুরুদেবের বিছানায়।"

"গুরুদেবের বিছানায় ? বলিস কী !" অবাক হয়ে বলি।

"হ্যাঁ বাবা, গুরুদেবের বিছানায়।"

ও, তা হলে তো বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা কী। রেজাল্ট দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু পাছে আমি বকি বা মারি, সেই ভয়ে একেবারে স্রেফ গুরুদেবের বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। জানে তো, আর যাই করি না কেন, গুরুদেবের সামনে কিছু বলব না, বা বলতেও পারব না। বললেও গুরুদেব বাঁচাবেন। অথচ, গুরুদেবকে ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

হাজার চেষ্টা করেও উত্তেজনা দমন করা সেদিন বড় কঠিন হয়ে উঠল আমার পক্ষে। অফিসের ফাইলটা একবার করে খুলছি, আবার বন্ধ করছি। চা-হাতে অভ্রর মায়ের পায়ের শব্দের প্রত্যাশা করছি, অথচ নিরাশ হতে হচ্ছে প্রতিবারই। অভ্রর অভিযোগ, শুভ্রর আচরণ প্রতি মুহূর্তেই যেন আমার মেজাজের পারাটাকে উর্ধ্বমুখী করতে লাগল। তার ওপর মাথার ওপর আছেন স্বয়ং গুরুদেব।

চোখের সামনে থেকে অফিসের ফাইলটা সরিয়ে রেখে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম। তারপর দুই করতলে চোখ চাপা দিয়ে, টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে চুপচাপ বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবতে থাকলাম। তা হলে কি অভ্রর মায়ের কথাটাই ঠিক ? সত্যিই কি কোনও গ্রহদোষ ঘটেছে শুভ্রর ? নাকি ওটা আমারই হয়েছে ? শুনেছি শনি বক্রি থাকলে কোনও কাজেই সফল হওয়া যায় না। কিম্বা লগ্নের

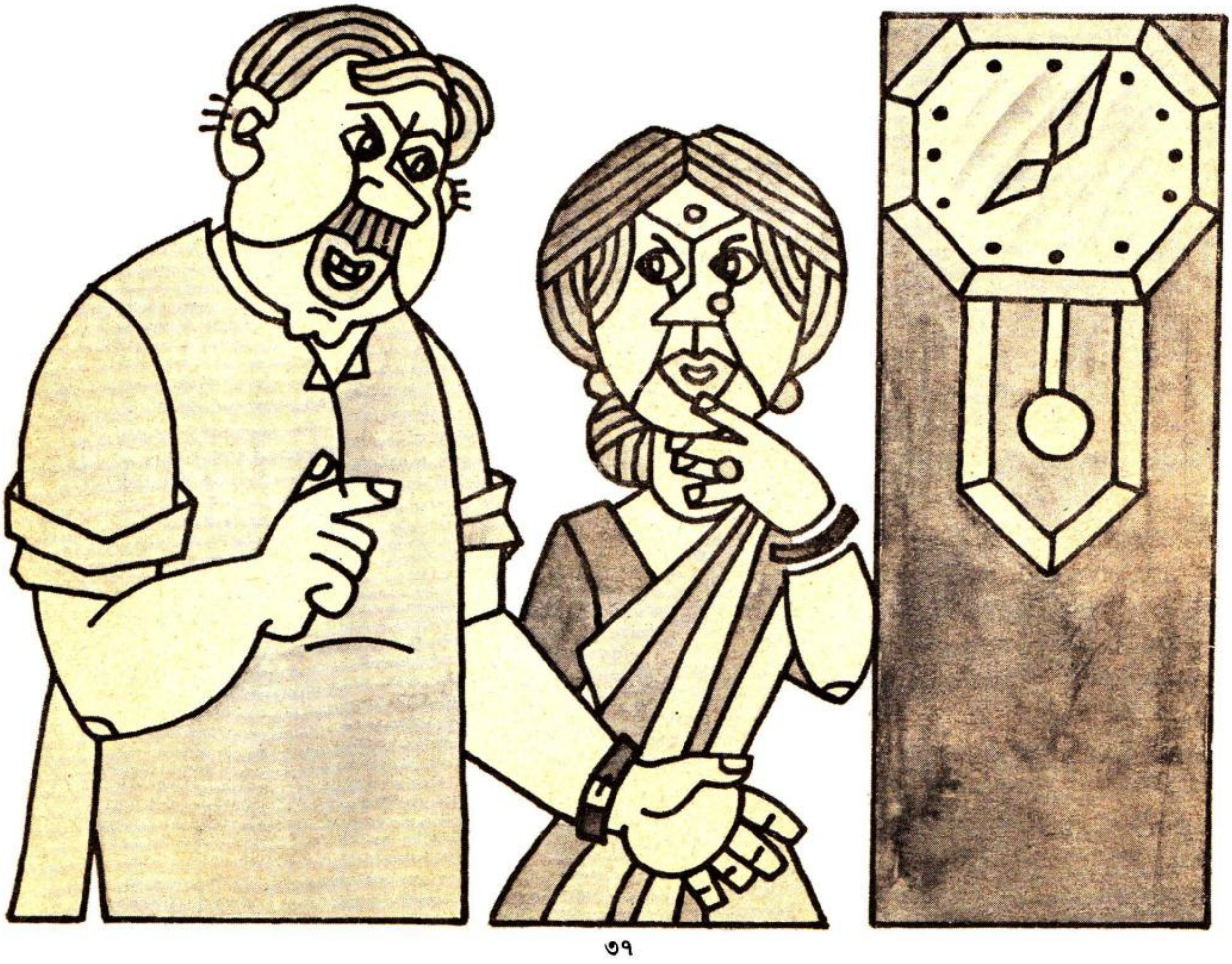

অঙ্গে অঙ্গে
লিরিল-এর
তরতাজা করা তরঙ্গ!
লিরিল—এবার এক সতেজতা মাখা, রেশ টেনে রাখা
অনন্য সুরভিতে—মধুর সুরভি, যেন চনমনে তরতাজা করা
মধুর তরঙ্গ—অঙ্গে অঙ্গে ছুঁইয়ে দেয় সেই অনন্য মধুর আবেশ,
যার নামটি হ'ল লিরিল-এর সতেজতা!
লিরিল—লেবুর মত চনমনে তরতাজা করা সাবান।
নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!
NEW
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
LINTAS LR 44 2719 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

চতুর্থে রাহুর অবস্থান ঘটেনি তো ? তবে কেন এত পারিবারিক অশান্তি ? অতগুলো টাকা খরচ করে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আই-কিউ টেস্ট করালাম। সাইকিয়াট্রিস্ট তো কোনও গণ্ডগোল পেলেনই না, উপরন্তু ওর ইনটেলিজেন্সের প্রখরতা নিয়ে যে সার্টিফিকেট উনি দিলেন, তাতে ওর অভিভাবক হিসেবে গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠবার কথা। ভবিষ্যতে এ ছেলে নাকি বিদ্যাসাগর কি স্যার আশুতোষ গোছের কেউ একজন হলেও হতে পারে। কার্যক্ষেত্রে সেই ছেলে কিনা একেবারে ঠিক তার উলটোটি। যখন ছোট ছিল, বুঝত না কিছুই, লাল কালির ঢ্যাঁড়া দেওয়া পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডখানা হাসতে-হাসতে হাতে তুলে দিত, দিয়েও হাসতে থাকত। নয় আর নব্বুই দুটো সংখ্যাই ওর কাছে তখন সমান মূল্যের। কিন্তু এখন তো সে-বয়েস আর নেই! ক্লাস সেভেনের ছেলের এই ছেলেমানুষিটা এখন আর কোনওমতেই বরদাস্ত করা চলে না। ফেল করার লজ্জাতেই হোক, আর বকুনি খাওয়ার ভয়েই হোক, রেজাল্টখানা সে লুকিয়ে রেখেছে সন্দেহ নেই। সবার যদি দিয়ে থাকে, ওরই বা দেবে না কেন ? মাইনে তো ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্লিয়ার। সেশন ফি ইত্যাদিও বাকি কিছু নেই যে রেজাল্ট আটকে দেবে!

তা হলে ?

আবার ঘরে ঢুকল অভ্র। এবং সেই একই কথা, "ভানুর কাছে গেছলাম বাবা, শুভ্রর সেকশানেই পড়ে। রেজাল্ট ওদের দিয়ে দিয়েছে।"

অভ্রর কথায় কোনও সাড়া দিলাম না। কী আছে সাড়া দেবার! বুঝতেই যখন পারা যাচ্ছে, তখন এক-কথা একশ'বার বলার দরকারটা কী ? তাতে উত্তেজনাটাই বাড়বে, ফল হবে না কিছুই। অভ্রর বয়েস অল্প, ভাইয়ের এই মিথ্যাচারণটা, বিশেষ করে তার বাবার কাছে, সহ্য করতে পারছে না মোটেই। কিংবা এমনও হতে পারে, দাদাগিরি ফলাবার এই সুযোগটাকে সে হাতছাড়া করতে চায় না। তাই, বারবার সে ছুটে ছুটে যাচ্ছে একবার এর বাড়ি, একবার ওর বাড়ি। যতক্ষণ না আসল সত্যটাকে সে বার করতে পারে, তা সে আমাকে উত্তেজিত করে ভাইকে মার-বকুনি খাইয়েই হোক, কিম্বা অন্য কোনও ভাবেই হোক, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে কিছুতেই।

আমার কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল অভ্র। বলল, "তুমি চা-জলখাবার খেয়েছ বাবা ? মা দেয়নি এখনও ? তা চলো না, ওপরে গিয়েই বসবে। জামাকাপড় ছেড়ে, হাত-পা ধুয়ে তুমি তৈরি হও, আমি মাকে তাড়া লাগাই।"

যেমন এসেছিল, তেমনি এক ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভ্র। যাবার সময়েও আর একবার বলে গেল, "আর বসে থেকো না বাবা, এক্ষুনি চলে এসো।"

এত দুঃখেও হাসি পেল মনে-মনে। শুভ্রর সামনে আমাকে সে হাজির করাবেই। আর, আমার হাজিরা মানেই, অভ্র ভাল ভাবেই জানে, শুভ্রর কী দশা হবে!

অগত্যা উঠেই পড়লাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে ঠিকই করে নিলাম, গুরুদেবের সামনে আজ আর কোনও সিন ক্রিয়েট করব না। ছেলের অকৃতকার্যতার জন্যে যে ছেলের চেয়ে বাবা-মায়েরাই বেশি দায়ী, একথা আমিও যেমন বুঝি, গুরুদেবও নিশ্চয় তার চেয়ে কম বোঝেন না।

খানিক পরেই যথাসম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রেখে গুরুদেবের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। গালচে পাতা খাটের ওপর দু'পাশে দুটো তাকিয়া নিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন তিনি তাঁর সেই সদাপ্রসন্ন ভঙ্গিটি নিয়ে। টাকমাথার তিন পাশ ঘিরে সাদা চুলের বেড়া। সামনে চওড়া কপালে ঝোলানো, মাদুরের মতো, বয়সের বলিরেখা। গায়ের রঙটা শ্লেট পাথরের মতো হলেও চেহারাখানি কিন্তু বেশ মাংসল। হাতের মুঠোয় ধরা সাত হাত লম্বা গড়গড়ার নলের মুখটা। একটু আগেই জলখাবার খেয়ে উঠেছেন, তাই মুখে বড়এলাচের দানা নিয়ে তামাক সেবনের পরিতৃপ্তিতে আত্মমগ্ন হয়ে আছেন।

গুরুদেবের এই ভঙ্গিটা বড় ভাল লাগে অভ্রর। বিশেষ করে নলের মধ্যে বুড়ুক-বুড়ুক শব্দ আর সেইসঙ্গে ধোঁয়ার মধ্যে মিষ্টি গন্ধ। তামাক ছাড়া গুরুদেবের আর কোনও নেশা নেই। অথচ আমার বাড়িতে গড়গড়ার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। তাই সারা চিৎপুর ঢুঁড়ে একরাশ টাকা খরচ করে সাত হাত লম্বা নলসমেত এই গড়গড়া কিনে এনেছি, খুঁজেপেতে সংগ্রহ করেছি মিঠেকড়া বিষ্টুপুরি তামাক। প্রথম প্রথম আমি নিজে সেজে দিতাম তামাক, কল্কে ধরিয়ে দিতাম। পরে, আমার তো অফিস, অভ্রর মা-ই বেশ আগ্রহভরে শিখে নিলেন কাজটা। যদিও ওঁর মতে এটা কাজ নয়, সেবা। গুরুদেবের সেবা। আমি কেবল একদিন বাদে বাদে নলটা পরিষ্কার করে দিই, যেটা আজও অফিস যাওয়ার আগে করে দিয়ে গিয়েছি। দিনেরাতে বার-ছয়েক খাওয়াদাওয়ার পর এই গড়গড়ার দরকার হয় গুরুদেবের।

যেখানেই থাকুক, এই সময়টায় কিন্তু অভ্র ঠিকই ছুটে আসবে গুরুদেবের দিকে। নিশ্চল পাথরের মতো চোখ দুটি বন্ধ করে মুখ দিয়ে হাওয়া টেনে টেনে যে শব্দটা তোলেন আর পাতলা সুগন্ধী ধোঁয়ায় ঘরটা ভরিয়ে দেন তিনি, তাতে অভ্রর মনে যে কী শিহরন জাগে তা সেই জানে।

আমার পায়ের আওয়াজে ঠোঁটের ডগায় নলটা একবার ছুঁইয়েই গুরুদেব গেলেন। ঘাড়টা অল্প ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "এসো বাবাজি, এসো।"

আসব কী, গুরুদেবের পেছনে হেলানো বালিশের আড়ালে শায়িত শুভ্রকে দেখে মুহূর্তের জন্যে রক্তটা আমার চনমন করে উঠল একবার। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, দিব্যি অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

অভ্র দাঁড়িয়ে ছিল খাটের বাজুটা ধরে। চোখ দুটো স্থির নলের ডগায়। গড়গড়ার মাথায় কল্কেতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সবেমাত্র, মিষ্টি একটা গন্ধে ঘর যেন ম-ম করতে শুরু করেছে। নল দিয়ে এখুনি যে শব্দটা উঠবে, অভ্র বোধ হয় তারই অপেক্ষায় রয়েছে।

খাটের পাশ থেকে বেতের মোড়াটা বার করে বসতে না বসতেই গুরুদেব শুরু করলেন তাঁর কথা। প্রথমে কুশল সংবাদাদি, তার পরই গীতা-ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতবর্ষণ। অনেক গুণের মধ্যে এটিও একটি মস্ত গুণ গুরুদেবের। সারাদিন কথা বলেন না, কিংবা বলার মতো লোক পান না, কিন্তু একবার পেলে আর রক্ষে নেই। প্রায়-নিদন্ত মুখে ধারা শ্রাবণের মতো একটানা যেভাবে সংস্কৃত শ্লোক আর তার ব্যাখ্যা তিনি আউড়ে যান, তাতে জগৎ-সংসার সম্বন্ধে ধারণাটাই পাল্টে যায়। কিন্তু আমি আশির দশকের

জীবনসংগ্রামী মানুষ। নিতান্তই ছা-পোষা মধ্যবিত্তদের একজন। এত তত্ত্বকথা শোনার মতো মেজাজ আর মর্জি আমার নেই। তাই গুরুদেব যখন সমানে বলে চলেছেন, আমি তখন ভাবছি আমার ছেলের কথা। এইভাবে যদি শুভ্র চলে এবং আমিও চলতে দিই, তা হলে তো ভবিষ্যৎ তার একেবারে ফর্সা।

অভ্র এর মধ্যে অন্তত বার পাঁচেক ঘর থেকে বেরিয়েছে আর ঢুকেছে। তত্ত্বকথায় গুরুদেব এমনই মত্ত যে, মুখের কাছে এনেও নলটায় তিনি ভাল করে টান দিচ্ছেন না। আর মাঝে মাঝে দিলেও এমনভাবে দিচ্ছেন যে, তা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। নিঃশব্দ গড়গড়া দেখতে কিংবা নির্ধূম মুখের বাণী শুনতে সে বোধহয় নিতান্তই নারাজ। তাই একবার করে আসে, তাকায় নলের দিকে কিংবা কল্কের দিকে, আবার বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে আটটা বাজতেই একসময় ঘরে ঢুকলেন অভ্রর মা। আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, "বাবাকে আর বকিয়ো না, ওঁর খাবার সময় হয়েছে খেতে রাত হলে ওঁর হজমের বড় ব্যাঘাত ঘটে। তুমিও নাও না, ওই সঙ্গে বসে যাবে। আর শুভ্রকেও ডেকে দাও, বিকেল থেকে আজ জলখাবার পর্যন্ত কিছু খায়নি ছেলেটা !"

একদমে কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বটে অভ্রর মা, কিন্তু আমার মেজাজটাকে দিল আরেক দফা বিগড়িয়ে। বাবাকে অর্থাৎ গুরুদেবকে নাকি আমিই বকাচ্ছি এতক্ষণ ! খানিক গুম হয়ে থেকে তুলে দিলাম শুভ্রকে খাট থেকে। চোখ পিটপিট করে একবার আমার দিকে তাকাল সে, তারপর ভয়ে যেন সিঁটিয়ে গিয়ে পায়ে-পায়ে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল।

বড় ঘরখানায় আমাদের সবাইয়েরই ঠাঁই করা হয়েছিল। গুরুদেবেরটা একটু তফাতে।

অভ্র বসতে গিয়েও বসল না। বলল, "আমি একটু পরে খাব মা, আমার ঠিক খিদে পায়নি এখনও।"

"সে কী রে ! এই তো বললি বড্ড খিদে পেয়েছে, খেতে দাও !"

মায়ের কথার জবাবে অভ্র আবার বলল, "না, একটু পরেই খাব।"

"বুঝি না বাপু তোদের মন-মেজাজ ! এই বললি, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও, পরেই আবার বলছিস খিদে নেই, পরে খাব। যাকগে, যা ইচ্ছে তাই কর।"

একে-একে খাবারগুলো ধরে দিলেন অভ্রর মা। গুরুদেবের সঙ্গে আজ আর আমাদের খাবারের তফাত নেই কোনও। লুচি, বেগুনভাজা, ফুলকপির তরকারি, খেজুরের চাটনি আর শেষ পাতে একবাটি করে পায়েস। গেরস্তর যে অবস্থাই হোক, গুরুদেবকে কিন্তু খাইয়ে আনন্দ আছে। এই বয়সেও, বলা উচিত নয়, তা বেশ খান। খান-তিরিশেক লুচি, সেই পরিমাণ ভাজাভুজি তরকারি, এবং বড় এক জামবাটি পায়েস। খেতে বসে কথা বলেন না গুরুদেব। শুধু জিব আর তালু দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করেন মাত্র। এবং তাইতেই বোঝা যায়, উনি যা কিছু খান বেশ আয়েস করেই খান।

পায়েসের বাটিটা শেষ করতে কয়েকটা চুমুক মাত্র লাগল গুরুদেবের। তারপর মিষ্টির রেকাবি পাতে রেখে রাজভোগ চারটে গোটা-গোটাই মুখে পুরে দিলেন তিনি। চোখ বুজে সেগুলো গলাধঃকরণ করে জল খাবার পর একটা পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলে বললেন, "তোমরা যদি এরকম পাখির আহার করো বাবাজি, বাঁচবে ক'দিন ? খাবে, খাবে, পেট পুরে খাবে, তাতে শরীর সুস্থ থাকবে, পরমায়ু বাড়বে। না খেলে খাটবে কিসের জোরে ?"

ঠোঁটের পাশে হাসির ভান করে চুপ করে রইলাম বটে, কিন্তু মনে মনে যা বললাম, তা মুখে না প্রকাশ করাই বোধ হয় ভাল।

তামাক আগে থেকেই সেজে রেখেছেন অভ্রর মা। ঘরে ফিরে পাথরের রেকাবি থেকে দু'চার দানা বড় এলাচ তুলে নিয়ে মুখে ফেললেন গুরুদেব। তারপর সেই চিরপরিচিত ভঙ্গিতে আসনপিঁড়ি হয়ে খাটের ওপর বসে গড়গড়ার নলটা হাতে তুলে নিলেন। বলা বাহুল্য, শব্দ এবং গন্ধের লোভে আগে থেকেই খাটের বাজুর কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল অভ্র। নলের মধ্যে দিয়ে হাওয়া টানার বুড়ুক বুড়ুক শব্দটা কানে আসতেই মুখটা তার মৃদু হাসিতে যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। একদৃষ্টে সে চেয়ে ছিল সোনালি জরি জড়ানো নলটার দিকে, হয়তো আরও কিছুক্ষণ থাকতও, কিন্তু বাদ সাধলেন তার মা। পেছন থেকে হঠাৎ ডেকে বসলেন, "কী রে, এবার খাবি, নাকি এখনও খিদে হয়নি ?"

দেওয়াল-ঘড়িতে সাড়ে ন'টার ঘণ্টা পড়তেই একগাল পাতলা ধোঁয়া ছেড়ে গুরুদেব বলে উঠলেন, "যাও ভাই, এবার খেয়ে নাও। রাত অনেক হয়েছে। অধিক রাত্রে ভোজন শাস্ত্রবিরুদ্ধ !"

পরিতৃপ্তির দ্বিতীয় উদ্গার তুলে চোখ বন্ধ করে আবার নলে টান দিতে থাকলেন তিনি। এবার ঘন ঘন। সুগন্ধি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সারা ঘরখানা। ঘর ছেড়ে বেরোবার ঠিক ইচ্ছে যে অভ্রর ছিল তা নয়, কিন্তু মায়ের তাড়া আর গুরুদেবের হুকুম আর সে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। একবার আমার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমার মন কিন্তু তখন গুরুদেবে বদ্ধ নয়। যতক্ষণ না শুভ্রর রেজাল্টটা আর সেই চিঠিখানা হাতে পাচ্ছি, ততক্ষণে যেন আর স্বস্তি নেই আমার। রেজাল্ট কী হয়েছে, সে তো বুঝতেই পারছি। এখন বেশি দরকার চিঠিখানা। স্কুলের নির্দেশটা জানা দরকার। শুভ্র ইতিমধ্যেই খাবার ঘরের তক্তপোশের ওপর দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়েছে। এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়, তাই আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে যথাসম্ভব কোমল গলায় ডাকলাম, "শুভ্র ! শুভ্র ! এই শুভ্র..."

কিন্তু সাড়া পেলাম না কোনও। আবার ডাকলাম। তবুও সাড়া নেই।

অভ্রকে খেতে দিতে দিতে ওর মা হঠাৎ যেন ঝাঁজিয়ে উঠলেন, "ঘুমন্ত ছেলেটাকে অত ডাকাডাকি করছ কেন ? যা বলবে কাল সকালেই বোলো। জানোই তো, বিছানায় পড়তে যা ওর দেরি ! এ তো আর অভ্র নয় যে, শুয়ে শুয়ে মাঝরাত পর্যন্ত কড়িকাঠ গুনবে।"

অভ্র একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর মায়ের দিকে। আমার মানসিক অবস্থাটা বোধহয় ও খানিক বুঝতে পারছে। গুম হয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না, রইলামও তাই। অভ্রর

খাওয়া শেষ হল, পাশের ঘরে মশারি খাটিয়ে গুরুদেবের শোবার ব্যবস্থা হল, এ-ঘরেও এঁটো পেড়ে একদফা বিছানা পাতা হল মেঝেয়, আরেক দফা তক্তপোশে। মশারি খাটিয়ে, মাথার কাছে তাকের ওপর জলের গেলাস রেখে, দরজার সামনে গুরুদেবের প্রসাদী পাতে যখন খেতে বসলেন অভ্র মা, ঘড়িতে তখন রাত প্রায় এগারোটা। তার মানে শুভ্রর ঘুমের মাঝ-প্রহর।

ক'বছর আগে হলে এ টেনশানকে আমি গ্রাহ্যই করতাম না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই করতে হয়। তাই একটার বদলে দুটো ঘুমের বড়ি সেদিন খেতে হল। মেঝের মশারির ভেতর অভ্র তখন, মাঝরাত পর্যন্ত কড়িকাঠ গোনার কথা ওর মা যাই বলুন না কেন, নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। বিকেল থেকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ওপর-নীচ করার ধকল তো কম যায়নি! ওর পাশে আমার বালিশ, আমিও মশারির ভেতর ঢুকে পড়লাম আস্তে-আস্তে।

কিন্তু আলো না নিভোলে ঘুম আসে কী করে! অভ্রর মায়ের খাওয়া শেষ হল বটে, কিন্তু কাজ মিটল না। তক্তপোশের ধারে পিঁড়েয় বসানো তোরঙ্গটার তলায় হাত গলিয়ে কী যেন খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করলাম, তারপর একসময় আপনা থেকেই মুখ দিয়ে আমার বিরক্তির ভাষাটা বেরিয়ে এল, "কী, ব্যাপার কী, এখনও কী খুটখাট করছ বলো তো? রাত যে অনেক হল! আলোটা নিবোবে না?"

খাওয়া-দাওয়ার পর নিচু হয়ে অন্ধকার পিঁড়ের তলাটা হাতড়াতে হাতড়াতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন অভ্রর মা। বললেন, "আলো কি আর সাধ করে জ্বালিয়ে রেখেছি? তোরঙ্গের পাশে আলতার শিশি পেলাম তো তুলিটা দেখতে পাচ্ছি না! সারাদিনের পর কোথায় একটু আলতা ছোঁয়াব পায়ে, তা তোমাদের ছেলেদের জ্বালায় কি হবার জো আছে!"

"আলতার তুলি নিয়ে ছেলেরা কী করবে?"

"কী করবে আবার!" হাঁফাতে-হাঁফাতে উঠে দাঁড়ালেন অভ্রর মা, "ছবিতে রং বোলাবে। ছবি রং করার জন্যে যে অতগুলো তুলি কিনে দিয়েছিলে, সব ক'টা খুঁচিয়ে পুড়িয়ে শেষে আমার আলতার তুলিটাকে নিয়ে টানাটানি! কী অকালকুষ্মাণ্ড দুটোই না আমার কপালে জুটেছে!"

বুঝলাম, মেজাজ চড়তে শুরু করে দিয়েছে অভ্রর মায়ের। তাই শান্ত গলাকে আরও শান্ত করে বললাম, "এই তো আঙুলের সাইজের একটা তার, অন্ধকারে কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছে! কাল দিনের আলোয় খুঁজো, পেয়ে যাবে'খন। রাত অনেক হয়েছে, এখন শুয়ে পড়ো।"

"শুয়ে পড়ব কী, বাবা বলেছেন স্বামীর কল্যাণের জন্যে একটু হলেও প্রতিদিন আলতা ছোঁয়াতে হয় পায়ে। তা সারাদিন সময় পাইনি আজ, ভাবলাম কোথায়—"

বাধা দিয়ে বললাম, "সে ছোঁয়াতে হয়, কড়ে আঙুল দিয়ে না-হয় একটু ছুঁইয়ে নাও।"

"বাবার নজর বড় ভীষণ। দেখতে পেলে কাল ভোরে উঠেই হয়তো আবার বকাঝকা করতে শুরু করে দেবেন!"

অনেক কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। বললাম, "বাবা কিছু বললে আমি সামলাব'খন, এখন শুয়ে পড়ো তো! রাত করে শুচ্ছ, যদি উঠতে দেরি হয়, বাবার সেবার ত্রুটি হয়ে যাবে। উনি তো আবার সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে স্নান-আহ্নিক সারেন!"

বিজ্ঞান নিয়ে গল্পের মতো বই

ছোটদের মনকে বাল্যবয়স থেকে যাতে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা যায়, তার জন্য আনন্দ পাবলিশার্স একের-পর-এক বই বার করে চলেছে। পার্থসারথি চক্রবর্তী বা অরূপরতন ভট্টাচার্যর বইগুলির কথা তো তোমরা জানোই, এ-ছাড়াও রয়েছে আরও বহু বই যেখানে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানীদের জীবনী আর আবিষ্কারের গল্প খুব সহজ করে ও খুব আকর্ষণীয় করে শোনানো হয়েছে। যেমন, সমরজিৎ করের 'অগ্রজ বিজ্ঞানী', অমরনাথ রায়ের 'দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী'। প্রথমটিতে এ-দেশের বিজ্ঞানীদের জীবনী ; দ্বিতীয়টিতে আড়াই হাজার বছরে স্বদেশে-বিদেশে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানীদের জীবনী। সহজে পৃথিবী পরিচয় ঘটানোর জন্য সাধনা মুখোপাধ্যায় লিখে চলেছেন 'জানা অজানা' গ্রন্থমালা। দু-খণ্ড বেরিয়েছে। একটিতে পৃথিবী ও আকাশের রহস্যের কথা, অন্যটিতে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান নদী ও শহরের কথা। 'খনি থেকে খনিজ' বা 'তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ' কিংবা 'এরোপ্লেনের জানা অজানা'—এ-সব বইয়ের বিষয়বস্তু নাম থেকেই ধরা যায়। শুধু যা বলার তা হল, প্রতিটি বইতেই বিজ্ঞান যেন গল্প-কথা। স্বাদু ও সহজবোধ্য। কৌতূহল-মেটানো ও সরস।

অশোককুমার মিত্র
এরোপ্লেনের জানা অজানা ॥ ৮·০০
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খনি থেকে খনিজ ॥ ৮·০০
ডঃ কাশীনাথ দত্ত
তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ॥ ৫·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ॥ ১৫·০০
সমরজিৎ কর
অগ্রজ বিজ্ঞানী ॥ ১৫·০০
সাধনা মুখোপাধ্যায়
জানা অজানা (১) ॥ ৮·০০
জানা অজানা (২) ॥ ১৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

'বাবার সেবার ত্রুটি হয়ে যাবে' কথাটা মোক্ষম অস্ত্রের কাজ করল সঙ্গে সঙ্গে। "তা তুমি যখন বলছ, তাইই করি !" বলে দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের ঠাকুরের ছবির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আলোটা নিভিয়ে তক্তপোশের বিছানায় গিয়ে ঢুকলেন অভ্র মা। হয়তো সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ঘুমিয়েও পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। মিথ্যে বলব না, এর জন্যে ঈর্ষা যে মাঝে-মাঝে আমার একটু না জাগে তা নয়। এরা বেশ আছে। বিছানায় পড়ে আর ঘুমোয়। আর আমি ? বিনিদ্র হয়ে রাস্তার মোড়ের রকের আড্ডার আওয়াজ শুনি। কুকুরের ঘেউ ঘেউ, কিংবা রিকশার ঠুং ঠাং। রাত নিশুতি হলে বহু দূর থেকে ভেসে-আসা ট্রেন চলার আওয়াজও কানে আসে কখনও-কখনও। সারা বাড়ি নিশ্চুপ। ইঁদুরছুঁচোর কিচিরমিচির, বেড়ালে বেড়ালে ঝগড়া, মশারির ভেতরে কিংবা বাইরে মশার ভন্‌ভন্‌, ছোট বড় সবরকম আওয়াজের সঙ্গেই যেন আমি পরিচিত।

দুটো বড়ি খাওয়ার ফলেই সেদিন বোধহয় তন্দ্রাটা আমার একটু আগেভাগেই এসে গেল। ওয়াড়-পরানো পাতলা কম্বলটা কান পর্যন্ত চাপা দিয়ে, পাশবালিশটা কাছে টেনে নিয়ে আয়েস করে চোখ দুটো বুজেছি সবে, হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজে চমকে উঠলাম। "কে রে ?" বলে উঠতেই শুভ্রর গলা পেলাম, "বাথরুমে যাব।"

অভ্র কি শুভ্র, দুজনের কারওই আলোর দরকার হয় না রাত্রে বাইরে বেরোতে হলে। ছেলেবেলা থেকে এ-সাহসটুকু ওদের দুজনেরই আছে। দরজাটা আধ-ভেজানো রেখে শুভ্র দিব্যি বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘরে ফিরে না-আসা পর্যন্ত তন্দ্রার ঘোরটা একটুক্ষণের জন্যে আমাকে কিন্তু ঠেকিয়ে রাখতে হল। হাজার হলেও ছেলেমানুষ, কোনও কারণে ভয় পেতে কতক্ষণ ! অবশ্য গুরুদেবের ঘরের দরজা খোলা আছে, থাকেও সারারাত। জানলা দুটোও সেই সঙ্গে। বন্ধ ঘরে উনি শোন না কখনও। তা ছাড়া একটা জিরো পাওয়ারের আলোও জ্বলে। রাত্রে ওঠবার দরকার হলে, নতুন জায়গায় একটু অসুবিধে হতে পারে। হাজার হলেও বুড়ো মানুষ তো !

কিন্তু শুভ্রর এত দেরি হচ্ছে কেন ? অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল ! একবার দেখতে হয় ! আর কিছু না হোক, ঘুম-চোখে অন্ধকারে কোথাও পড়ে যেতেও তো পারে !

আরও মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে সবে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একটা জোরালো আলোর ঝলকানিতে চোখ দুটো যেন আমার ঝলসে গেল। এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তাকিয়ে দেখি, দোরের সামনে দাঁড়িয়ে শুভ্র। আলোটা একটা টর্চের, আর সেটা ফোকাস করা শুভ্রর মুখের ওপর। ফোকাস যে করছে, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং অভ্র। আমারই পাশ থেকে, শুয়ে শুয়েই। এবং সেই সঙ্গে অভ্রর গলা, "কী রে, একেবারে নিরাশ হয়ে ফিরে এলি তো ?"

শুভ্র যেন হঠাৎ কেমন থতিয়ে গেছে মনে হল। এবং বলা বাহুল্য, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও। চমকে উঠে বলে উঠলাম, "কী হল ? তুই ঘুমোসনি এখনও অভ্র ?"

আমার কথার জবাব পাবার আগেই শুভ্রর চোরের মতো আমতা-আমতা গলা শুনতে পেলাম, "ভাল হবে না বলে দিচ্ছি দাদা ! চোখের ওপর থেকে আলোটা সরা আগে !"

ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল অভ্র। হাতের জ্বলন্ত টর্চের জোরালো আলোটা সার্কাস-পার্টির আকাশ-ফোঁড়া হেডলাইটের মতো সারা ঘরখানা একবার ঘুরে এল, তারপরই সুইচ টিপে ইলেকট্রিক আলোটা জ্বালাবার সঙ্গে-সঙ্গেই টর্চটা নিভিয়ে দিল সে।

আমার তো চোখের পলক পড়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে তখন। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। অভ্র কি সত্যিই ঘুমোচ্ছিল এতক্ষণ, নাকি নাক ডাকিয়ে ঘুমের ভান করে জেগেই ছিল ? কিন্তু কেন ? শুভ্র বাইরে থেকে আসার সঙ্গে-সঙ্গে টর্চের আলোটাই বা ওর মুখে ফেলল কেন সে, আর হঠাৎ নিরাশ হওয়ার কথাটাই বা বলল কেন ? কিসে নিরাশ হল শুভ্র ? কথাটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে মশারির একপাশটা তুলে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় শুভ্রর থুতনি ধরে একটু নেড়ে দিয়ে অভ্র মুখে একটা চুকচুক শব্দ করে বলে উঠল, "আহা-হা, বড্ড হতাশ হলি, না ?"

থুতনি থেকে দাদার হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে নিতান্তই ছেলেমানুষি রাগ দেখিয়ে শুভ্র বলল, "তুই তো একটা বাটপাড় ! চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছিস তুই !"

হতাশ, চোর, বাটপাড় ! মাঝরাতে পাগলের মতো এসব কী বলাবলি করছে এরা ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ওদিকে অভ্রর মায়েরও ঘুম তখন ভেঙে গেছে। কাঁচা ঘুমে ব্যাঘাত হওয়ার ফলেই বোধহয় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চোখ বড় বড় করে বলে উঠলেন, "কী, ব্যাপার কী ? রাত দুপুরে এ তোরা কী শুরু করেছিস ? কোঁদল করতে হয়, যা, রাস্তায় গিয়ে কর গে ! সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোব, তারও জো নেই। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠেও খুনসুটি ! এই অভ্র, হলটা কী ?"

অভ্র নির্বিকার গলায় বলল, "কী হয়েছে, তোমার ছোট ছেলেকেই জিজ্ঞেস করো না !"

"কী রে শুভ্র," গা থেকে লেপটা সরিয়ে উঠে পড়লেন অভ্রর মা, "অভ্র তোকে ওরকম করছে কেন, কী করেছিস তুই ?"

শুভ্র কোনও জবাব দেবার আগেই অভ্র হাসতে হাসতে বলে উঠল, "চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে তোমার ছোট ছেলে, আদরের দুলাল !"

"তার মানে !" গলায় আমার বিস্ময় যেন আর বাগ মানল না, "চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে মানে ? কী বলছিস তুই ?"

"হ্যাঁ বাবা, ঠিকই বলছি ।" অভ্র মাতব্বরের মতো বলল, "ইস্কুল থেকে পরীক্ষার রেজাল্টখানা এনে ও লুকিয়ে রেখেছিল । মাঝরাতে উঠে সবার অলক্ষ্যে সেটাই ও বার করে আনতে গেছল ।"

"তার মানে ? রেজাল্টখানা পাওয়া গেছে ? কোথায় সেটা ?"

আমার কথার জবাবে হাতের ইঙ্গিতে আমাকে ব্যস্ত হতে বারণ করে অভ্র বলল, "সেটা আমার কাছে আছে । দিচ্ছি এক্ষুনি, একটু সবুর করো !"

"রেখেছিল কোথায় ?" সবিস্ময়ে আবার প্রশ্ন করি ।

"রেখেছিল, তা শুভ্রর মাথায় বুদ্ধি আছে বলতে হবে, রেখেছিল এমন একটা জায়গায় যেখানে রাখার কথা সহজে কেউ চিন্তাও করতে পারবে না ।"

"তার মানে !" বিস্ময় যেন চেপে রাখতে পারছিলাম না আমি, "কোথায় ?"

"গড়গড়ার নলের ভেতর ।"

"গড়গড়ার নলের ভেতর ? সে কী রে ! ঢোকাল কী করে ?"

"বলছি, বলছি, সব বলছি ।" ভারিক্কি চালে অভ্র বলে উঠল, "ইস্কুল থেকে যে ও রেজাল্টখানা পেয়েছে, সে খবর তো আমি আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম । বিকেলে খেলেটেলে ফিরে আসার সময় পর্যন্ত ওটা ওর কাছেই ছিল । তারপর সন্ধের সময় গুরুদেব যখন আহ্নিক করতে বসেন, সেই সময় খাটের আড়ালে থেকে আস্তে আস্তে ও গড়গড়ার নলের মুখটা খুলে ফেলে । নলের মুখটা যে খোলা যায়, সেটা ও সেদিন জানত, যেদিন তুমি ওটা কিনে নিয়ে এসে পরিষ্কার করেছিলে । আমার সঙ্গে-দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেদিন ওটা ও লক্ষ করেছিল । তারপর আজ সন্ধেবেলায় রেজাল্ট আর চিঠিটাকে পাকিয়ে সুড়ুত করে দিলে নলের মধ্যে ঢুকিয়ে । তারপর নলের মুখটা লাগিয়ে দিয়েই ঘুমের ভান করে পড়ে রইল গুরুদেবের খাটে । আমি প্রথমে ওর পড়ার জায়গায় বইখাতার মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম । কিন্তু যখন দেখলাম রাখেনি, তখন সমস্ত ঘরখানা বলতে গেলে একরকম চষে ফেললাম । নাঃ, কোথাও পেলাম না । তা হলে কোথায় রাখতে পারে ? হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল, শুভ্র আজ গুরুদেবের খাটে কেন শুয়ে ? ও তো গুরুদেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না ! তা হলে ? তা হলে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও কারণ আছে । সেই কারণটা খুঁজতে গিয়েই মনে হল, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, গুরুদেবের ঘরেই কোথাও রেখেছে ওখানা ? খাটের ওপর শুয়ে থাকলে পাহারাকে পাহারাও দেওয়া হবে, আর বাবার বকুনি থেকেও বাঁচা যাবে । গুরুদেবের সামনে তো আর বাবা কিছু বলতে পারবে না ।"

শুভ্রর দিকে ফিরল অভ্র, "কী রে, ঠিক বলছি কি না ?"

শুভ্র কোনও জবাব দিল না, মুখটা নিচু করে রইল ।

"কিন্তু তুই বুঝলি কী করে যে ওটা অন্য কোথাও রাখেনি, গড়গড়ার নলের মধ্যেই রেখেছে ?"

"প্রথমটায় বুঝতে পারিনি । ভেবেছিলাম হয়তো গুরুদেবের খাটের তোশকের তলায়-টলায় কোথাও রেখেছে । আমি ঠিকই করে নিয়েছিলাম যে, রাত্রিবেলা গুরুদেব যখন খেতে বসবেন এ-ঘরে, সেই ফাঁকে টুক করে ওঁর ঘরে ঢুকে একবার চারদিকটা চিরুনি চালিয়ে নেব । গুরুদেবের ঘরে তুমি যখন ঢুকলে, তার আগেই ওখানে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিলাম তোশকের তলা ছাড়া আর কোথাও রাখা সম্ভব কি না । ছোট্ট একখানা কাগজ, যেখানে হোক রাখা যায় তো ! কিন্তু হঠাৎ যখন নজর পড়ল যে, গুরুদেব গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছেন অথচ ধোঁয়া বেরোচ্ছে না, তখনই আমার সন্দেহটা কেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল । অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করলাম ব্যাপারটা । মুখের কাছে নলটা নিয়ে গিয়ে যতবারই টানছেন, তেমন হাওয়া আসছে না ভেতর থেকে । ফলে নল থেকে কোনও শব্দও যেমন বেরোচ্ছে না, তেমনি নল টানা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কল্কে থেকে সুতোর মতো সরু একটা যে ধোঁয়া ওঠে, তাও উঠছে না । লক্ষ করলাম নলে টান দিতে দিতে বিরক্তিতে গুরুদেবের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠছে মাঝে-মাঝে । বোধহয় তামাক টেনে সুখ পাচ্ছিলেন না বলে । শেষ পর্যন্ত নলটা হাতে ধরে রইলেন তিনি ঠিকই, কিন্তু ঠোঁটে আর ঠেকালেন না । তোমার সঙ্গে ধর্ম-আলোচনায় তখন তিনি এমনই মগ্ন যে, তামাক খাওয়ার কথা বোধহয় ভুলেই গেলেন একেবারে । গড়গড়া থেকে যে শব্দ বেরোচ্ছে না, তার কারণ একটাই হতে পারে । নলের ভেতরের প্যাসেজটা হয়তো বুজে গেছে । অথচ সেটা হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই । কারণ আজই সকালে তুমি নলটা পরিষ্কার করে দিয়েছ ।"

একবার থামল অভ্র, বোধহয় দম নিল । তারপর ফের বলল, "বড্ড খিদে পেয়েছে বলে মাকে তাড়া লাগালাম, যাতে মা তোমাদের খাওয়ার আয়োজন করে এ-ঘরে । সেই সুযোগে আমিও ও-ঘরে ঢুকে গড়গড়াটা একবার চট্ করে দেখে নেব । নিলামও তাই । এবং যেটা খুঁজছিলাম, পেয়েও গেলাম । খেতে চেয়ে খেতে না-বসার কারণটা হল এই ।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু শুভ্র যে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে আবার ওই কাগজখানা বার করবার জন্যে ও-ঘরে যাবে, এটা তুই অনুমান করলি কী করে ?"

"এমন কিছু কঠিন নয় । শুভ্র জানত যদি সন্ধান করি, তা হলে প্রথমেই আমি ওর পড়ার জায়গায় করব, পরে অন্য জায়গায় । তাই প্রথমটায় ও কাগজখানা অন্য জায়গায় রাখল, পরে ও জানত, একবার পড়ার জায়গা হাঁটকানো হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর সেখানটা দেখব না । তাই অন্য জায়গায় সার্চ করার আগেই আবার পড়ার জায়গায় সরিয়ে ফেলবে কাগজখানা । তাই খেয়েদেয়ে বিছানায় গিয়ে ও শুল বটে, কিন্তু স্রেফ ঘুমের ভান করে পড়ে রইল । মনে মনে ও ঠিকই করে রেখেছিল, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, সেই সময় ও আস্তে-আস্তে উঠে গিয়ে গড়গড়ার নল থেকে বার করে আনবে । গুরুদেবের ঘরের দরজা তো সারারাত খোলাই

থাকে, সেই সঙ্গে একটা টিমটিমে আলোও জ্বলে। আর আমিও সেটা অনুমান করে, যা কখনও করি না সেই নাক ডেকে গাঢ় ঘুমের ভান করে রইলাম বিছানায়, মাথার বালিশের পাশে টর্চটা রেখে। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, গুরুদেবের ঘর থেকে নিরাশ হয়ে ফিরলেই ওকে ধরব।"

শুভ্রর দিকে ফিরল অভ্র, "হ্যাঁ রে শুভ্র, আমার আন্দাজ ঠিক-ঠিক হয়েছে তো ?"

শুভ্র তখন মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করেছে।

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠলাম, "কিন্তু নলের ভেতর সরু করে পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা কাগজখানা তুই বার করলি কী করে ? ও তো একেবারে এঁটে বসে যাবার কথা !"

"তা ঠিক," বিজ্ঞের মতো অভ্র বলল, "এঁটেই বসে গেছল ওটা অনেক ধৈর্য ধরে অনেক কসরত করে তবে বার করতে পেরেছি। একটু আগেই মা রাগারাগি করছিল না আলতার তুলি নিয়ে ? সেই তুলির তারটা দিয়েই তো কাজটা করতে হল। নইলে ওই সরু ফাঁক দিয়ে ঢোকানো যায় যত সহজে, বার করা কি তত সহজ !"

"রেজাল্টখানা কোথায় ?"

গলার স্বরটাকে খাদে নামিয়ে অভ্র বলল, "বার করছি, কিন্তু কাগজ দু'খানার যা অবস্থা হয়েছে নলের মধ্যে রেখে, দ্যাখো লেখাগুলো পড়তে পারো কি না।"

মশারির ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে মাথার দিকের টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল অভ্র। টেবিলক্লথের একটা কোণ তুলে বার করল বহুদিনের পুরনো ঠিকুজির মতো দেখতে ময়লা দু'খানা কাগজ। হাতে নিয়ে আলোর কাছে মেলে ধরে পড়তে গিয়েই কিন্তু আমার চোখ ছানাবড়া হবার জোগাড় ! আনন্দে, উত্তেজনায় সারা শরীরটা আমার কেমন যেন শিরশির করে উঠল।

প্রতিটি সাবজেক্টেই বলতে গেলে হাইয়েস্ট মার্ক। অঙ্কেতে একেবারে পুরো নম্বর একশোর মধ্যে একশো।

অভ্রর দিকে ফিরে কথা বলতে গিয়ে গলাটা আমার কেঁপে উঠল বোধহয় : "কিন্তু, কিন্তু তুই যে বললি ও অঙ্ক ইংরেজি বিজ্ঞান-টিজ্ঞান অনেক সাবজেক্টেই গোল্লা পেয়েছে ?"

"ভানু তো আমাকে সেই কথাই বলল," নরম গলায় আমতা-আমতা করে অভ্র বলল।

"ভানু কি জানত না কিছুই ! ও তো ওর সেকশানেই পড়ে ?"

অভ্রর হয়ে এবার জবাব দিল শুভ্র। দুষ্টু হাসি হেসে বলল, "বুবাই আর ভানুকে তো আমি শিখিয়ে রেখেছিলাম। আমি জানতাম, দাদা ওদের জিজ্ঞেস করবেই। তা ছাড়া, বেশির ভাগ নম্বরই তো গোল্লা দিয়ে। অর্থাৎ শূন্য দিয়ে। সত্তর আশি নব্বই—সবেতেই তো একটা করে গোল্লা রয়েছে। অঙ্কে তো একেবারে দু-দুটো !"

"ও," অভ্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "বুঝেছি। পাছে কথা বলতে বলতে আসল কথা বেরিয়ে পড়ে, সেইজন্যে ভানু নীচে না নেমে দোতলার জানালা থেকেই আমার কথার জবাব দিয়েছিল। রাস্তা থেকে ঘাড় উঁচু করে চেঁচিয়ে আমিও সব কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি, পাছে পাড়াসুদ্ধ জানাজানি হয়ে যায়।"

"কিন্তু এই গোপনতার দরকার কী ছিল, শুভ্র ?"

শুভ্রর বদলে অভ্রই জবাব দিল, "আর কিছুই নয়, তোমাকে আমাকে মাকে সবাইকে একবারে চমকে দেবে।"

"না, এটা কিন্তু দাদা ঠিক বলতে পারল না।" ঠোঁট উলটে শুভ্র বলল।

"তা হলে ?"

"দাদাকে স্রেফ পরীক্ষা করবার জন্যে। কিছুদিন হল দাদার ভীষণ অহঙ্কার হয়েছে দেখছি। যখন-তখন সবাই ওর বুদ্ধির তারিফ করে তো ! তাই ভাবলাম, দেখি আমার সঙ্গে ও পারে কি না !"

"তা কী দেখলি শেষ পর্যন্ত ?" অভ্রর কথায় যেন এবার একটু কৃত্রিম শ্লেষ ঝরে পড়ল।

"দেখলাম, তোর বুদ্ধির ঘট শূন্য না হলেও একেবারে পূর্ণ নয়। পূর্ণ হলে তুই ভানুদের বাড়িতে দোতলায় উঠে সব জিজ্ঞেস করে আসতে পারতিস। তুই তো যাতায়াত করিসই ও-বাড়িতে।"

হেরে যাওয়ার লজ্জায় অভ্রর মুখটা পলকের জন্যে একবার লাল হয়ে উঠল।

শুভ্র অবশ্য সেদিকে কোনও খেয়ালই করল না। বলে চলল, "আমার মনে হয় বেস্পতিটা তোর খুব খারাপ যাচ্ছে। তাই মাঝে-মাঝে এমন বুদ্ধিভ্রংশ ঘটছে। মাকে বল, গুরুদেবকে বলে যদি এর কোনও বিহিত করা যায়।"

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে অভ্র বলল, "সেটা আমার চেয়ে তোর দরকার বেশি। তুই আজ এমন একটা কাজ করলি, যার শেষরক্ষা করতে পারলি না, ধরা পড়ে গেলি। কোন্ গ্রহের দোষে এটা হয়, আর তার প্রতিকারের কোনও পথ আছে কি না, কাল গুরুদেবকে আমি নিজেই তা জিজ্ঞেস করব'খন।"

বিছানায় বসে ছেলেদের কথাগুলো এতক্ষণ শুনছিলেন অভ্রর মা। অভ্রর কথা শেষ হতেই রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, "সবতাতে গুরুদেবকে কেন টানছিস রে হতভাগা ! তোরা যদি ওঁর পায়ের নখের যুগ্যি হতিস তো বত্তে যেতিস ! ফের যদি অমন কথা মুখে আনিস তো দেয়ালে মুখ রগড়ে দেব !"

শুভ্র সকৌতুকে গম্ভীর গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, "কেস খুব খারাপ। চটপট শুয়ে পড় দাদা। বাবা, তুমিও শুয়ে পড়ো। চিঠিখানা কাল পড়বে'খন। খারাপ কিছু নেই, তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন হেডমাস্টারমশাই।"

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

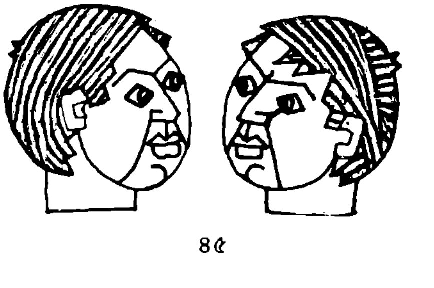

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে পঞ্চানন্দ জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভিদবিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে যে-মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, বাসের মধ্যে খুন হয় তাঁর সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চকসাহেবের পোড়োবাড়িতে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে। চকসাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। চকসাহেবের বাড়িতে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে ঘায়েল করে সেই তিনটে অতিকায় লোক, গজকে যারা আটকে রেখেছে। বিদ্যুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বুঝে এগিয়ে যেতেই কাঁকড়াবিছের কামড় খায় গজ, তারপর খানিক হেঁটে এক জলায় বেহুঁশ পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পঞ্চানন্দও খানিক এগিয়ে গজ'র খোঁজ পায়। কিন্তু গজ'র ছিপছিপে শরীর ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। তারপর…

আকাশ থেকে একটা অদ্ভুত বস্তু নেমে আসার দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল ঘড়ি। আসলে সে এ-বাড়িতে পঞ্চানন্দ নামে উটকো যে-লোকটা এসে জুটেছে তার ওপর নজর রাখবার জন্যই রাতে জেগে অপেক্ষা করছিল। ঘড়ির দৃঢ় বিশ্বাস তার ভালমানুষ এবং কবি-বাবাকে জপিয়ে হাত করে এ-লোকটা একটা বড় রকমের দাঁও মারার মতলবে আছে। লোকটা যে বিশেষ সুবিধের নয়, তা একনজরেই বোঝা যায়। কিন্তু ঘড়ির বাবা হরিবাবু বড়ই সরল সোজা এবং আপনভোলা মানুষ। কে খারাপ আর কে ভাল তা বিচার করার মতো চোখই তাঁর নেই। তাই সে-ভার ঘড়ি নিজে থেকেই নিল। চোর-জোচ্চোররা রাতের বেলাতেই সজাগ হয় এবং তাদের কাজকর্ম শুরু করে। ঘড়িও তাই গভীর রাতেই লোকটাকে হাতেনাতে ধরে ফেলার মতলবে ছিল।

যা ভেবেছিল হয়েও যাচ্ছিল তাই। নিশুত রাতে পঞ্চানন্দ বেরোল জরিবাবুর ঘর থেকে। নিঃশব্দ, চোরের মতোই হাবভাব। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ঘড়ি খুব তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল। কিন্তু লোকটাকে যে গিয়ে জাপটে ধরবে তার উপায় নেই। কারণ হরিবাবু রাত জেগে কবিতার পর কবিতা লিখে চলেছেন। শোরগোল হলেই উঠে এসে বকাবকি করবেন। ঘড়ি তাই লোকটাকে শুধু নজরে রাখছিল।

তবে লোকটা বিশেষ গণ্ডগোল পাকাল না। শুধু চারদিকটায় ঘুরে-ঘুরে কী একটু দেখে নিয়ে বেড়ালের মতো সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদে গিয়েই লোকটাকে ধরার সুবিধে হবে ভেবে যেই না ঘড়ি সিঁড়ির কাছে গেছে, অমনি হরিবাবু তাঁর ঘর থেকে 'উঃ আঃ' শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এসে ছাদপানে চললেন। ঘড়িকে কাজেই ক্ষ্যামা দিতে হল।

নিজের ঘরে এসে জানালা খুলে যখন ঘড়ি ছাদের পরিস্থিতিটা উৎকর্ণ হয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল, তখনই সে আকাশের অদ্ভুত বস্তুটা দেখতে পায়। অনেকটা পটলের আকৃতি, নীলাভ উজ্জ্বল একটি জিনিস ধীরে-ধীরে নেমে আসছে।

তখন ঘড়ি তার ঘুমকাতুরে ভাই আংটিকে ডেকে তুলল, "এই ওঠ, দ্যাখ কী কাণ্ড হচ্ছে।"

আংটি উঠে জিনিসটা দেখল এবং রুদ্ধশ্বাসে বলল, "উফো, আন-আয়ডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট।"

অপলক চোখে দুই ভাই জিনিসটা লক্ষ করতে লাগল। কিন্তু হঠাৎই আলো নিবে গিয়ে বস্তুটা অন্ধকার হয়ে গেল। আর দেখা গেল না।

ডাকাবুকো বলে দুই ভাইয়েরই খ্যাতি আছে। তারা সহজে ভয় খায় না। দুনিয়ায় তাদের যত ভয় বাবাকে। অথচ হরিবাবুর মতো নিরীহ আনমনা ভালমানুষ লোক হয় না। ছেলেদের গায়ে তিনি কখনও হাত তোলেননি। বকাঝকাও করেন না বড় একটা। তবু দুই ডানপিটে ভাই ওই একজনকে যমের মতো ডরায়। আর কাউকে বা কিছুতেই তারা ভয় পায় না। উড়ন্ত-চাকিকেই বা পাবে কেন ?

দুই ভাই চটপট শীতের পোশাক পরে নিল। মাথায় বাঁদুরে টুপি আর হাতে দস্তানা পরতেও ভুলল না। অস্ত্র বলতে ঘড়ির একটা স্কাউট ছুরি আর আংটির চমৎকার একটা গুলতি। আর সম্বল গায়ের জোর এবং মগজের বুদ্ধি।

এ শহরের সবরকম শর্টকাট তাদের জানা। কাজেই গজ-পালোয়ানের আস্তানায় পৌঁছুতে দেরি হল না।

চক-সাহেবের বাড়ির পর বিশাল জলা। তার ওপাশে তুঁতেবন। আর আছে বিখ্যাত সেই রাজবাড়ির ঢিবি। জায়গাটা বেশ গোলমেলে। অজস্র ঝোপঝাড় আর জলকাদায় দুর্গম। তবে ঘড়ি আর আংটি এ জায়গা নিজেদের হাতের তেলোর মতোই চেনে।

ঘড়ি চারদিকে চেয়ে বলল, "আমার যতদূর মনে হয় উফোটা জলার ওপাশে তুঁতেবনের দিকে কোথাও নেমেছে।"

আংটি গম্ভীর মুখে বলল, "হুঁ, কিন্তু জলা পার হবি কী করে ?"

আসলে আংটি একটু শীতকাতুরে।

ঘড়ি গম্ভীর মুখে বলল, "জলা পার হতে হলে জলে নামতে হবে।"

"ও বাবা, আমি বরং এদিকটায় পাহারা দিই, তুই এগিয়ে দেখে আয়।"

ঘড়ি কিন্তু এই প্রস্তাবে আপত্তি করল না। পকেট থেকে ছোট্ট একটা টর্চ বের করে চারদিকটা দেখে নিয়ে বলল, "চক-সাহেবের বাড়িতে একটু আগে একটা আলো দেখেছি। যতদূর জানি, গজ-পালোয়ান এখন ও-বাড়িতে নেই। কিন্তু

আলো যখন দেখা গেছে, তখন কেউ না কেউ আছে ঠিকই। তুই চারদিকে নজর রাখিস। বিশেষ করে চক-সাহেবের বাড়ির দিকটায়। আমি জলার ওদিকটা দেখে আসছি।"

আংটি ঘাড় নাড়ল প্রকাণ্ড একটা হাই তুলতে তুলতে। তারপর বলল, "আমি বরং চক-সাহেবের বাড়িতেই গিয়ে ঢুকে পড়ি। গজদার বিছানাটা পড়ে আছে, একটু গড়িয়ে নিইগে। তুই ফিরে এসে আমাকে ডেকে নিস।"

ঘড়ি তার প্যান্টের পা গুটিয়ে জুতোসুদ্ধু জলে নেমে পড়ল।

অন্ধকারে জলার মধ্যে ঘড়ি মিলিয়ে যাওয়ার পর আংটি আর-একটা বিকট হাই তুলল। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে। কৌতূহল তার যতই হোক শীত আর রাতজাগা সে একদম সইতে পারে না।

চক-সাহেবের বাড়ি বেশি দূর নয়। আংটি চারদিকটা লক্ষ করতে করতে গিয়ে বাড়িটায় ঢুকে পড়ল। ঘড়ি বলল আলো জ্বলতে দেখেছে, কিন্তু আংটি কোথাও কোনও আলোর চিহ্ন পেল না। তবু সাবধানের মার নেই। সে চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিল। না, কোথাও কেউ নেই। গজ-পালোয়ানের ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে দেখল, চৌকির ওপর বিছানাটা পাতাই রয়েছে। সামান্য কিছু জিনিসপত্র যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে।

আংটি আর একটা হাই তুলে বিছানার চাদরটা তুলে ভাল করে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। গায়ে গরমজামা থাকায় তেমন শীত করল না। ঘুমও এসে গেল টপ করে।

গাঢ় ঘুমের সময় মানুষের শ্বাস যেমন ঘন-ঘন পড়ে, সেরকমই শ্বাস পড়তে লাগল আংটির। মৃদু-মৃদু নাকও ডাকছিল তার।

মিনিট পনেরো কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ খুব ধীরে-ধীরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। নিঃশব্দে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল দরজায়।

জলা পার হতে ঘড়ির বিশেষ সময় লাগল না। জল থেকে ডাঙায় উঠে সে টর্চ জ্বেলে পায়ে জোঁক লেগেছে কি না দেখে নিল। তারপর রাজবাড়ির ঢিবির নীচে উঁচু জমিতে উঠে জুতো খুলে মোজাটা নিংড়ে নিয়ে ফের পরল।

তুঁতেবন এখনও বেশ খানিকটা দূরে। ঘড়ি উঠল। উঠতে গিয়েই হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঢিবিটার গায়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বেশ বড় একটা গর্ত। এরকম গর্ত থাকার কথা নয়। আর আশ্চর্যের কথা, গর্তের ভিতর থেকে একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ঘড়ি ভারী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার মনে হল, মহাকাশযানটা ওই ঢিবির মধ্যে গিয়ে সেঁধোয়নি তো!

ঘড়ি ধীরে-ধীরে ঢিবির ঢাল বেয়ে গর্তটার মুখ-বরাবর চলে এল। ভয় যে করছিল না তা নয়। কিন্তু কৌতূহলটাই অনেক বেশি জোরালো।

ঢিবির মুখে এসে সাবধানে উঁকি দিয়ে ভিতরে যা দেখল, তাতে বেশ অবাক হয়ে গেল সে। দিব্যি আলোকিত সুড়ঙ্গ। ভিতরটা বেশ পরিষ্কার।

যেন চুম্বকের টানে সম্মোহিতের মতো ঘড়ি ভিতরে ঢুকল। চারদিকে চেয়ে সে বুঝল, ঢিবিটা সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তা মোটেই মিথ্যে নয়। বাস্তবিকই এখানে কোনওদিন একটা প্রাসাদ ছিল।

কিন্তু তার চেয়েও যেটা বিস্ময়কর, তা হল, সুড়ঙ্গটাকে কে বা কারা খুব যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করেছে। ভিতরে খুঁড়ে খুঁড়ে ছোট বড় নানা রকম কুঠুরি বানিয়েছে। সব কুঠুরিরই দরজা বন্ধ। সুড়ঙ্গের ছাদে লাগানো আলোগুলো দেখে ঘড়ি হাঁ হয়ে গেল। ইলেকট্রিক লাইট নয়, স্রেফ এক-একটা উজ্জ্বল পাথর।

খানিক দূর হেঁটে গিয়ে সে দেখতে পেল, সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ঘড়ি এগোতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছে, কেউ এসে পথ আটকাবে বা আক্রমণ করবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না।

ঘড়ি এসে থামল প্রকাণ্ড দরবার-ঘরে। চারদিকে অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি। কিন্তু কোনও মানুষজন নেই।

ঘড়ি যখন চারদিকে চেয়ে দেখছিল তখন হঠাৎ পায়ের কাছে একটা ইঁদুরকলের মতো ছোট্ট বাক্স নজরে পড়ল তার। এমনিতে পড়ত না, কিন্তু বাক্সের ডালাটা আপনা থেকেই খুলে যাচ্ছিল বলে তার চোখ আটকে গেল।

বাক্সের ভিতর থেকে একটা সবুজ কাঁকড়াবিছে বেরিয়ে এল।

ঘড়ি কাঁকড়াবিছে ভালই চেনে। অনেকবার ধরে সুতোয় বেঁধে খেলা করেছে। এক-আধবার হুলও খেয়েছে। কাজেই সে বিশেষ ভয় খেল না। ফট করে এক পা পিছিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখল।

কাঁকড়াবিছে সবুজ রঙের হয় কি না তার জানা নেই। তবে সে কখনও দ্যাখেনি।

বিছেটা তাকে লক্ষ করেই এগিয়ে আসছে, এটা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হল না ঘড়ির। বাক্সের ডালা আপনা থেকেই খুলে যাওয়া এবং আশ্চর্য সবুজ রঙের বিছের আবির্ভাবের পিছনে যে রহস্য আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন ঘড়ির নেই। আপাতত প্রয়োজন আত্মরক্ষা।

ঘড়ি বিছেটার সামনে জুতোসুদ্ধু পা এগিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে হুলের শুঁড়টা দু' আঙুলে চেপে ধরে বিছেটাকে তুলে নিল। এই অবস্থায় বিছে খুবই অসহায়।

হুলটা সাবধানে ধরে রেখে বিছেটাকে কাছ থেকে যখন দেখল ঘড়ি, তখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারল, এটা আসল কাঁকড়াবিছে মোটেই নয়। বিছেটার শরীর ধাতু দিয়ে তৈরি। ভিতরে স্প্রিং আছে, তার জোরে বিছের পা নড়ে। মুখের কাছে একটা লম্বা দাঁড়া রয়েছে যা অনেকটা সূক্ষ্ম টেলিস্কোপিক অ্যান্টেনার মতো।

হুলটা ভাল করে লক্ষ করল ঘড়ি। যা দেখল, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হুলের বদলে যেটা বারবার বেরিয়ে আসছে, তা স্টেনলেস স্টিলের তৈরি একটা ফাঁপা ছুঁচ। অনেকটা ইনজেকশন দেওয়ার ছুঁচের মতোই।

ঘড়ি তার রুমালটা বের করে ছুঁচের মুখে ধরতেই সেটা বিঁধে গেল রুমালে আর কয়েক ফোঁটা ভারী সুগন্ধি তরল বস্তু বেরিয়ে এল ছুঁচ থেকে। (ক্রমশ)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

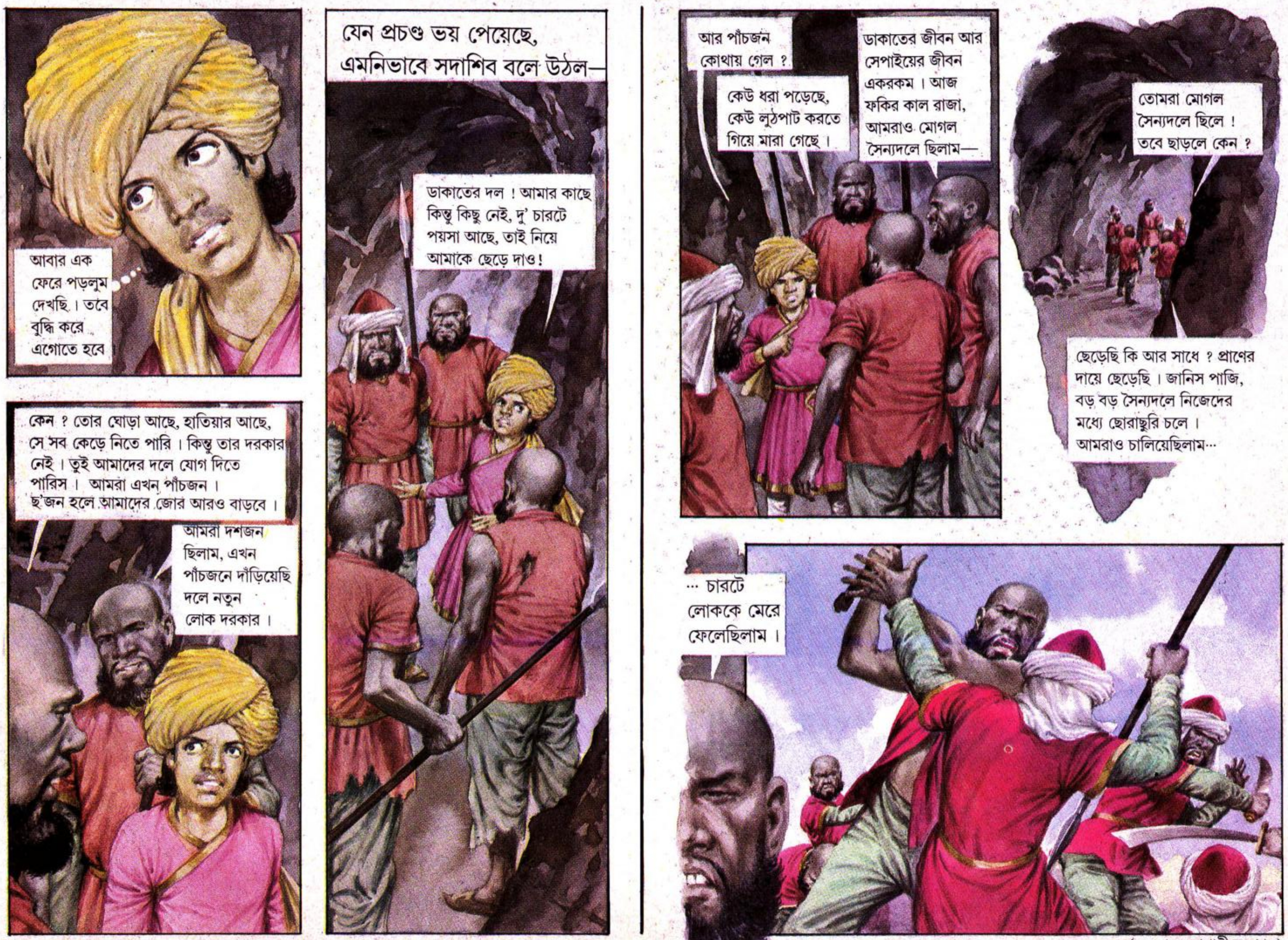

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ছবি এঁকেছে **অনুভব দত্ত** (বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে **নীলাঞ্জনা মজুমদার** (বয়স ১৪)

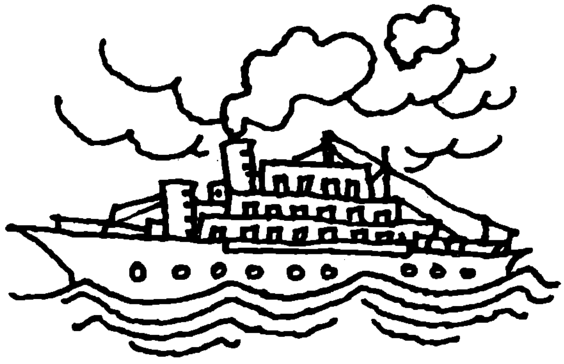

আন্দামানের ডায়েরি

১৮ জুলাই ॥ আমি, বাবা ও মা হর্ষবর্ধন জাহাজে উঠেছি। পুরো জাহাজটা এয়ারকণ্ডিশনড। কিছুক্ষণ বাদে জাহাজ ছাড়বে।

১৯ জুলাই ॥ জাহাজটার বেশ গতি, আশা করা যায়, কাল বিকেলের মধ্যে পোর্টব্লেয়ার পৌঁছে যাব, বাপ্‌রে, কী দুলুনি ! হাত কাঁপছে ঝাঁকুনির চোটে। এখন আমরা কলকাতা থেকে ৪৫৫ কিঃ মিঃ দূরে।

২১ জুলাই ॥ একটু আগে আমরা জাহাজ থেকে পোর্টব্লেয়ারে নেমেছি। মালপত্র নিয়ে সোজা নিখিলকাকুর বাড়ি। নিখিলকাকু বাবার বন্ধু।

২২ জুলাই ॥ আজ গেলাম 'লিট্‌ল আন্দামান' বলে একটা দ্বীপে। ৫ কিঃ মিঃ লম্বা। এখানে একটা কাঁচের কারখানা আছে। বছর পঁচিশ আগেও নাকি এখানে জঙ্গল ছিল। দ্বীপটা এমন কিছু ভাল নয়। খুব ধুলো ওড়ে। এখান থেকে ১৬০ কিঃ মিঃ দূরে 'কামরটা' বলে একটা দ্বীপে ৮০ ঘর জারোয়া একদম স্বাধীনভাবে বাস করে।

২৩ জুলাই ॥ আজ আমরা 'মিড্‌ল আন্দামানে' গিয়েছিলাম। কাল রাত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। এক-কোমর জল জমেছিল, তবে খুব তাড়াতাড়ি নেমে গেছে। বাজারে শৌখিন সামগ্রী বলতে একটাই, ঝিনুকের মালা। তাই গোটাকতক কিনলাম। এখানে মাছ, নারকেল ও কচ্ছপের মাংস পাওয়া যায়। এখানকার পুলিশ হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো পরে।

২৬ জুলাই ॥ পরশু আমরা লঞ্চে করে 'গ্রেট নিকোবরে' এসেছি, আজ আড়াই দিন ধরে কী ঝড়, কী ঝড় ! একটা ছোট্ট হোটেলে আছি। বাইরে বেরুনো একদম মানা। প্রচণ্ড হাওয়া, কলকাতায় এমন ঝড় আমি দেখেছি বলে মনে হয় না। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে 'পাইগমালায়ন পয়েন্ট' বলে একটা জায়গা আছে। ওটা হল ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার সীমান্ত-এলাকা। বছর-দুয়েক আগে ওখানে একটা ঝড়ে দুটো দ্বীপ তলিয়ে গেছে। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

২৮ জুলাই ॥ কয়েক ঘন্টা আগে সাউথ আন্দামানে ফিরেছি। সমুদ্রে আর ঝড় নেই, কিন্তু কী ঢেউ ! লঞ্চ এদিক-ওদিক দুলছিল। আন্দামানের প্রায় সবই দেখা হয়ে গেছে। একটাই শুধু আক্ষেপ রয়ে গেল, সেলুলার জেলটা দেখা হল না। কারণ ওটা এখন সারানো হচ্ছে। তবে দূর থেকে দেখলাম, আর মনে-মনে প্রণাম করলাম সেইসব বীরদের, যাঁরা একদিন এখানে বন্দী ছিলেন।

২৯ জুলাই ॥ এখন পোর্টব্লেয়ার এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি, ওখান থেকে প্লেন ধরে সোজা কলকাতা। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি কিছু বই, ঝিনুকের মালা আর আন্দামানের স্মৃতি।

যুগায়ক চট্টোপাধ্যায়

পোষা পায়রা

আমার পোষা পায়রাটি
নেড়ো না তোমার ডানা দুটি
বেড়ালছানা একটি পাড়ার
দেখলে তোমায় করবে সাবাড়
তুমি সাবধানেতে থেকো
বিপদ হলে আমায় ডেকো
লাঠি দিয়ে পিটিয়ে
দেব তাকে ভাগিয়ে
সে যদি মিউমিউ করে
ভয় দেখিও বকম্‌-বকম্‌ স্বরে
সে আসবে না তো কাছে
যদি ঠোকর মারো পাছে
জোরে জোরে ঠোকর মেরো
যেমন করে আমায় মারো
ভয়েই হবে কুপোকাত
বন্ধ হবে উৎপাত

অর্পিতা নন্দী (বয়স ১১)

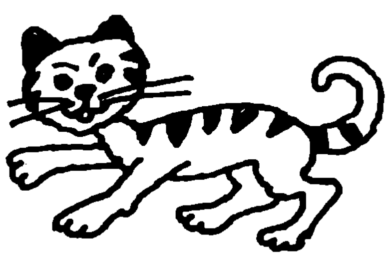

ডাক্তারবাবু বলছেন

শীতে কী করবে

শীত যত জাঁকিয়ে পড়ছে, আবহাওয়াও তত ভাল হচ্ছে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, তাই শীতের আমেজ এলে শরীর ঝরঝরে হয়ে ওঠে।

এখন একটু সাবধানে থাকলে কোনও রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যাদের হাঁপানি আছে, এই সময় সেই রোগ বেড়ে যেতে পারে। যাদের সর্দির ধাত, তাদেরও সর্দি-কাসি বাড়তে পারে।

যাদের হাঁপানি আছে, তারা ডিম, কাঁকড়া, চিংড়িমাছ, ইলিশমাছ, বেগুন, পাকাকলা খাবে না। এই সব খাবার থেকে হাঁপানি বাড়তে পারে। কারণ এগুলো হার্ডপ্রোটিন। পাকস্থলী এবং অন্ত্রে হজম হওয়ার সময় এই ধরনের খাদ্যকণা অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত না হয়ে পলিপেপটাইড-এ রূপান্তরিত হয়। এবং রক্তে মিশে হাঁপানির উদ্রেক করে।

যাদের হাঁপানি এবং সর্দির ধাত আছে, তারা এই সময়ে সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেলে খুব ভাল হয়। সমুদ্রের ধারে বাতাসে অক্সিজেন এবং ওজোন্ খুব বেশি থাকে, তাতে ফুসফুসের খুব উপকার হয়।

যারা সমুদ্রতীরে বেড়াতে যেতে পারবে না, তারা ভোরবেলায় উঠে ফাঁকা জায়গায় খানিকটা বেড়াবে। যদি শীত-শীত করে, তা হলে গায়ে গরম জামা আর গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে বেড়াবে। রোজ সকাল-সন্ধে চা-চামচের দু'চামচ করে খাঁটি মধু খাবে সারা শীতকাল। রোজ ভাল করে গরম তেল মেখে, গরম জলে স্নান করে ভাল করে গা হাত পা মাথা মুছে গরম জামা পরে নেবে। দু'বেলা খাওয়ার পর চা-চামচের এক চামচ করে ভাল কডলিভার অয়েল খেলেও ফুসফুস জোরালো হয় এবং হাঁপানি সর্দি-জ্বর অনেক কমে যায়। যাদের হাঁপানি ও সর্দি-জ্বর আছে তাদের দু'বেলা ভাত না খাওয়াই ভাল।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

জেনে নাও

খসখসে কাগজে লিখতে অসুবিধে হয় কেন

খসখসে কাগজে লিখতে অসুবিধে হয়, তাতে ভাল লেখা পড়ে না। তাই না? কেন?

কাগজের উপরে লিখবার সময়ে যখন পেন চলে, তখন কাগজের উপরে পেন তো ঘষতে হয়। এই যে ঘষে নিয়ে যাওয়া, এই ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়।

ঘর্ষণ আছে বলেই মাটিতে মারবেল গড়িয়ে দিলে তা বারবার চলতে থাকে না। কিছুদূর গিয়ে থেমে যায়। ঘর্ষণ বেশি হলে মারবেল সরবে আরও অল্প। খসখসে কাগজে ঘর্ষণ বেশি। তার উপরে কলম সরতে চায় না।

লেখার জন্যে ঘর্ষণও কিন্তু দরকার। বেশি চকচকে কাগজেও আবার লেখার অসুবিধে। তেল-মাখা কাগজে লেখা ফুটবেই না। ব্ল্যাকবোর্ডে যে লেখা ফোটে তা চক আর ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যে ঘর্ষণের জন্যে। আর ব্ল্যাকবোর্ড বেশি মসৃণ হলে সেখানে চক পিছলে যেতে থাকে, তখন কোনও লেখা ফোটানোই যায় না।

শীতকালে পশমের জামা পরি কেন

পৌষ, মাঘ মাসে যখন জাঁকিয়ে শীত পড়ে, তখন আর সুতির জামায় কাজ হয় না। সেই সময়ে পশমের জামা গায়ে চাপাতে হয়। নইলে শীত যায় না। কিন্তু পশমের জামা গায়ে দিলেই বা শীত যায় কেন?

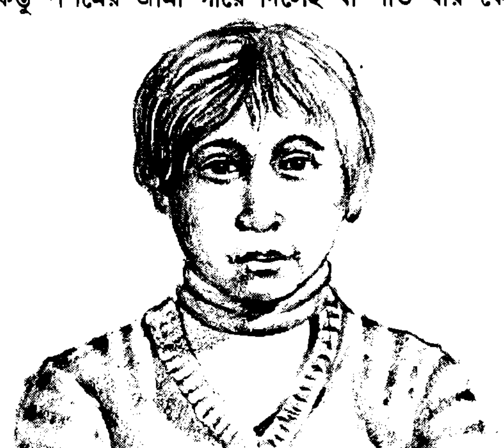

ছবি : পরমেশ পুরকায়স্থ

পশম তাপের কুপরিবাহী। পশমের ভেতর দিয়ে তাপ চলাচল খুব কম। সেইজন্যে দেহের যে তাপ তা দেহের ভেতর দিয়ে বাইরে যেতে বাধা পায়। পশমের ফাঁকে ফাঁকে আছে বাতাসের স্তর। বাতাসও খুব কুপরিবাহী। ফলে পশমের জামার কুপরিবাহিতা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

শরীরের তাপ তাই বাইরে বেরোতে রীতিমত বাধা পায় বলে পশমের জামায় শরীর গরম থাকে। সেইজন্যে শীতকালে আমরা পশমের জামা পরি।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে চা-বাগানে এসেছিল। সে একটা বেওয়ারিশ ঘোড়ায় উঠেছিল। ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে সুধাময় সেন তাকে বিছের কামড় থেকে বাঁচান। তিনি নাকি নেতাজির ফৌজে ছিলেন, ইংরেজদের হাতে বন্দী হন, পালিয়ে দীর্ঘকাল জঙ্গলে আছেন, বাইরের জগতের খবর রাখেন না। সায়নকে তিনি যে জংলি মানুষদের ডেরায় নিয়ে যান, তাদের পোশাকে সেই অগ্নি-চিহ্ন, যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো ভয় পেয়েছিল। অন্যদের চোখ এড়িয়ে গুহায় ঢুকে সায়ন রহস্যের সন্ধান পায়, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে জ্ঞান হারায় সে। এক বৃদ্ধার সাহায্যে গুহা থেকে উদ্ধার পেয়ে সে দেখে, দু'জন বন্দী লোকের একজনকে মেরে ফেলা হল। অন্য বন্দীকে, গুপ্ত মালের হদিস দেবার জন্যে, নদীর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নদীতে নামায় বন্দী মারা যায়। যে তাকে বন্দী করেছিল, সেও। সায়ন তার ঘোড়াটাকে বশ করেছে। তারপর···

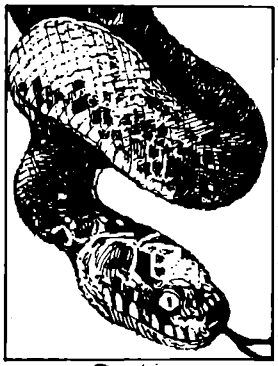

খুব শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঘোড়াটা। সায়ন ওকে টেনে নদীর কাছে নিয়ে এল। এই মাঝারি জলপ্রবাহে সেই হিংস্র প্রাণীটি তার খাবার নিয়ে নিশ্চিন্তে রয়েছে। ওপরে দাঁড়িয়ে তার অস্তিত্ব বোঝার উপায় নেই। যখন প্রাণীটি তাড়া করে এসেছিল তখনও স্পষ্ট দেখতে পায়নি সায়ন। ওটা কুমির নয়। কোনও বড় মাছ কি এইভাবে আক্রমণ করে ? হঠাৎ সেই ছবির দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। শান্ত সমুদ্রের সৈকত। কত মানুষ নিশ্চিন্তে স্নান করছে, রোদ পোহাচ্ছে। হঠাৎ একটা চিৎকার। সমুদ্রের জলে সামান্য আলোড়ন তুলে একটি মানুষ তার রক্ত জলে ছড়িয়ে দিয়ে হারিয়ে গেল কোথায়।

সায়ন দেখল যে বস্তাটা নিয়ে অশ্বারোহী নদী অতিক্রম করেছিল সেটা পড়ে আছে সামনে। দু'হাতে টেনেও সে বেশিদূরে সরাতে পারল না ওটাকে। তারপর কৌতূহলী হয়ে বস্তার মুখ খুলে চমকে গেল। ছোট-ছোট পিজবোর্ডের বাক্সে ঠাসা বস্তাটা। অশ্বারোহীর যদি সভ্যতার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না থাকে তা হলে এগুলো আসছে কোত্থেকে। কাল যে মানুষগুলোকে সে দেখেছে, যে বৃদ্ধা তার উপকার করেছে, সেই মানুষগুলোর সঙ্গে অশ্বারোহীদের কোনও সম্পর্ক নেই এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেই মানুষগুলো হয়তো সভ্য পৃথিবীর খবর জানে না, কিন্তু অশ্বারোহীরা জানে। ওরা এদের ভয় দেখিয়ে বশ করে রেখেছে এবং সেই কাজে সহযোগিতা করেছেন সুধাময় সেন। একটা পিজবোর্ডের বাক্স খুলতেই ঘড়ি দেখতে পেল সায়ন। অনেক ঘড়ি। নরম রোদের ছোঁয়া পেয়ে ঝকঝক করছে। ঘড়িগুলোর গায়ে বিদেশী নাম দেখতে পেল সে। সায়ন অনুমান করল এই মানুষগুলো কোনও চোরাচালানচক্রের সঙ্গে জড়িত। নিরাপদে কাজ করবে বলে ভুটানের এই দুর্গম এবং নির্জন পাহাড় বেছে নিয়েছে ওরা। সুধাময় সেন হয়তো এদের নেতা কিংবা ওইরকম কিছু। সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যাপারটার সঙ্গে যার কোনও মিল নেই।

বস্তাটাকে সেখানেই ফেলে রাখতে গিয়ে ও মত পালটাল। অশ্বারোহীর দেরি হচ্ছে দেখে ওরা যদি কেউ খুঁজতে আসে তা হলে বস্তাটা নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। হয়তো ওরা বুঝতে পারবে কী হয়েছিল। এই ঘড়ি এবং অন্যান্য প্যাকেটগুলো যে স্বাভাবিক নয় এটা সে বুঝতে পারছিল। খুব স্বচ্ছন্দে দুটো মানুষকে ওরা খুনও করতে পারল এর জন্যে। সায়ন কোনওরকমে বস্তাটাকে নদীর মধ্যে ঠেলে দিল। পড়ার সময় কিছু বাক্স হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর আধডোবা নৌকোর মতো ভাসতে ভাসতে ছুটে গেল নীচের দিকে। বস্তাবন্দী হয়ে বাকিগুলো ডুবে গেল জলে। ওপরে দাঁড়িয়ে তার আর কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না।

ঘোড়াটা আজও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সায়ন ওর গলায় হাত বোলাতে ঘোড়াটা আরামদায়ক একটা শব্দ নাক দিয়ে প্রকাশ করল। এই ঘোড়াটারও কোনও জিন নেই। তবে দুটো রেকাব একটা স্ট্র্যাপের দুই প্রান্তে বেঁধে পিঠের ওপর দিয়ে দু'পাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘোড়াটার পিঠ এবং পেট আর একটা স্ট্র্যাপে বাঁধা। রেকাবের স্ট্র্যাপটা সেটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় স্থানচ্যুত হবার ভয় নেই। সায়ন লাগামটাকে ধরে ঘোড়াটাকে লক্ষ করল। ওর পিঠে উঠলে প্রতিবাদ করবে না তো ! পাগলের মতো ছুটে তাকে অন্যান্য অশ্বারোহীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না তো ! সেরকম ঘটলে আর বাঁচার আশা থাকবে না।

সায়ন দুরুদুরু বুকে রেকাবে পা রেখে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসতে সেটা চারপায়ে সামান্য নাচল, নেচে স্থির হল। এবং তখনই সায়ন বুঝল এটা বেয়াড়াপনা করবে না। সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত শরীর ও মনে একটা আরাম ছড়িয়ে পড়ল। কতক্ষণ বাদে সে এইভাবে পা ছড়িয়ে বসতে পারল। কিন্তু আর দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি এই এলাকাটা ছেড়ে যেতে পারে তত মঙ্গল। এখন দিব্যি রোদ উঠে গেছে। রঙ পালটেছে তার। যদিও ঘন পাতার আড়ালে বনের মাটি অনেকটাই ঢাকা কিন্তু নদীর দিকে তাকালে তো বোঝা যায়। সায়ন ঘোড়াটাকে সামনে চলার ইঙ্গিত করতে সে বাধ্য ছেলের মতো এগিয়ে চলল। এই পথে কোনও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক পায়ে হাঁটা সম্ভব নয়। কিন্তু ঘোড়াটার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। সে দিব্যি নদীর গা বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল নীচের দিকে। সায়নের মনে হল, এটাই সঠিক পথ। এই নদী ধরে এগিয়ে গেলে সে কোনও না কোনও সময়ে সেই জায়গাটা দেখতে পাবে, যেখান দিয়ে তারা আসার সময় নদীটাকে অতিক্রম করেছিল। এখন মাথার ওপরে নেমে-আসা বুনো লতাপাতায় তার শরীর ছড়ে যাচ্ছে কিন্তু সে নিচু হয়ে ঘোড়াটার শরীর আঁকড়ে ধরে সেগুলোকে এড়াতে চাইছিল। তার কানে এখন নদীর স্রোতের শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই।

হঠাৎ ঘোড়াটা স্থির হয়ে গেল। সতর্ক চোখে ডান পাশের

জঙ্গলের দিকে তাকাল। তারপর তড়বড়িয়ে ছুটতে লাগল সামনে। যেন ভূতে তাড়া করেছে এমন ভঙ্গি তার। প্রাণপণে লাগামটাকে আঁকড়ে অনিবার্য পতন সামলাল সায়ন। তখনই তার চোখে পড়ল।

নদী এখানে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটে গেছে। কিছুটা জল নদীর শরীর থেকে আচমকা বের হয়ে স্থির হয়ে আছে চারপাশে বালি নিয়ে। দু'হাতে শক্ত করে লাগামটাকে টেনে ঘোড়াটাকে স্থির করতে পারল সায়ন। তারপর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ওপরের দিকে তাকাল। সেই দড়ির সিঁড়িটাকে লক্ষ করতে চেষ্টা করল। সুধাময় সেন কি ফিরে এসেছেন ইতিমধ্যে ? তিনি কি এখন তাঁর গুহায় অপেক্ষা করছেন প্রিয় হনুমানকে নিয়ে ! কোনও মানুষের উপস্থিতি সে বুঝতে পারল না। এ-পথে সামনে এগোতে গেলে জলে নামতেই হবে। নদী কত গভীর বোঝা যাচ্ছে না। আর সেই হিংস্র প্রাণীটি যদি কাছাকাছি থাকে তা হলে ঘোড়াটা কখনওই জলে নামবে না। অথচ সামনে যদি যেতেই হয়, তা হলে নদীতে নামতে হবে। এবং সে-ক্ষেত্রে ওপরে যদি সুধাময় সেন থাকেন তা হলে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাবেন। অনেক ভেবেচিন্তে পথ পরিবর্তনের কথা ভাবল সে। নদী ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে কোনওরকমে ঘোড়াটাকে ঢোকাতে পারল সায়ন। বুনো লতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে জঙ্গলটাকে। তার মধ্যে দিয়ে যেতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল ঘোড়াটার। আশেপাশে ভিতু জন্তুদের ছুটে যাওয়ার শব্দ হচ্ছিল। তখনই সায়নের পেতে-রাখা ফাঁদগুলোর কথা মনে পড়ল। সুধাময় সেনের শিকার সংগ্রহের ফাঁদে যদি ঘোড়াটা পড়ে যায় তা হলে আর দেখতে হবে না। অথচ কিছুই করবার নেই তার। ফাঁদগুলোকে ওপর থেকে চেনা মুশকিল। কিছুদূর যাওয়ার পর সেই পাকা কলার কাঁদিগুলো চোখে পড়তেই সায়নের সমস্ত শরীরে খিদে চনমন করে উঠল। ঘোড়ার পিঠে চেপেই সে একটার পর একটা কলা ছিঁড়ে খোসা ছাড়িয়ে খেতে লাগল। সুস্বাদু ফল তার খুব ভাল লাগছিল। আর এইসময় ঘোড়াটাও পরম আনন্দে পাতায় মুখ রাখল। বেশ-কিছুটা সময় পার হলে সায়নের আরাম এবং ক্লান্তি বোধ হল। যেন একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারলে সে বেঁচে যেত। চোখ ঘুমে কেবলই বুজে আসছে। অথচ এখন এই জঙ্গলে ঘোড়াটার পিঠ থেকে নামা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বন্যজন্তুর হাত থেকে ঘোড়াটা তাকে বাঁচাবে।

শেষ পর্যন্ত সায়ন আর পারল না। ঘোড়াটা যখন হাঁটে তখন তার পিঠে বসে থাকা মোটেই আরামদায়ক ব্যাপার নয়। ঘুম তখন আসতে পারে না। সে আরও একটু জঙ্গলের গভীরে চলে এল। এখানে মাথার ওপর এত ঘন পাতার আচ্ছাদন যে চট করে হদিস পাওয়া মুশকিল হবে কারও। লাগামটাকে সে একটা গাছের ডালে ফাঁস দিয়ে রাখল, যাতে ইচ্ছে হলেই সহজে খুলত পারে। কিন্তু ঘোড়াটা স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। ঘোড়াটাও নিশ্চয়ই ক্লান্ত ছিল। কারণ, সে পরমানন্দে খেয়ে যেতে লাগল বুনো ঘাস এবং মিষ্টি পাতা। দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল সায়ন। এভাবে সে কখনও শোয়নি, কিন্তু শরীরে এত ক্লান্তি যে ঘুম এসে গেল কিছু বুঝবার আগেই।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে জানা নেই। কিন্তু মাটিতে ধপ করে

পড়ে যেতে সায়নের চৈতন্য হল। ঘোড়াটা প্রচণ্ড ছটফট করছে। সামনের দু'পা তুলে লাফাতে চেষ্টা করছে। প্রাণপণে ছুটে যেতে চাইছে কিন্তু বাঁধন থাকায় বেচারা নড়তে পারছে না। ঘুমের চটক ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েই সায়ন পাথর হয়ে গেল। হাত-চারেক দূরে কুচকুচে কালো একটা সাপ চার-পাঁচ হাত উঁচু হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে। তার চোখ ঘোড়াটার দিকে। এতবড় ফণা কখনও দ্যাখেনি সে। অন্তত হাত-সাতেক লম্বা সাপটা। কিলবিলে অনুভূতি নিয়ে যেন কালো আলোর জেল্লা বের হচ্ছে ওর শরীর থেকে। সরু ফিনফিনে জিভ দু-তিনবার বাইরে বেরিয়ে এসে ভেতরে ঢুকে গেল। যে-কোনও মুহূর্তে ছোবল মারবে সাপটা। এরকম বীভৎস প্রাণী কখনও দ্যাখেনি সে। তাদের বাড়ির লনে যে সাপ দুটোকে সে দেখেছিল, তারা এর কাছে নিতান্তই শিশু।

তারপরই সায়নের মনে হল, সাপটা যেন একটু ঘাবড়েছে। ওর চোখ সায়নের দিকে আর ঘোড়ার দিকে সমান তালে ঘুরছে। ও বোধহয় সায়নের উপস্থিতি আগে লক্ষ করেনি। এই মুহূর্তে প্রথমে কাকে আক্রমণ করবে বুঝতে পারছিল না। ঘোড়াটা এখন একদম স্থির হয়ে গেছে। বোধহয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে সে পাথর হয়ে পড়েছিল। আর তখনই

পায়ের শব্দ উঠল। জঙ্গল মাড়াতে-মাড়াতে কারা যেন ছুটে আসছে। সাপটা আবার বিভ্রান্ত হল। হয়তো সে নিজের বিপদ অনুমান করল। তারপর ফণা নামিয়ে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেদিকে সড়াত করে অবলীলায় চলে গেল লম্বা শরীরটা নিয়ে। সম্বিৎ ফিরতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল সায়নের। ঘোড়াটা তখনও নড়ছে না। নিজের শরীরে কোনও সাড় আছে বলে বোধ হচ্ছিল না সায়নের। সে ঘোড়াটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই একটা পরিত্রাহি চিৎকারে জঙ্গলটা কেঁপে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে গুড়ুম করে একটা শব্দ হল। এত কাছাকাছি বন্দুকের আওয়াজ হতেই সচকিত হল সায়ন। আর ঘোড়াটা ছটফটিয়ে উঠল। প্রাণপণে ওর মুখ জাপটে ধরে শান্ত করতে চেষ্টা করল সায়ন। বন্দুক এবং মানুষের চিৎকার মানেই আর-এক ধরনের বিপদ। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার পায়ের আওয়াজ হল। এবার চিনতে পারল সে। বেশ কয়েকটা ঘোড়া ছুটে গেল জঙ্গল মাড়িয়ে।

আবার সব শান্ত হয়ে গেলে সায়ন ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসে ফাঁসটা খুলে নিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল মূল পথটার দিকে। আড়াল সরিয়ে কিছুটা যেতেই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। বুনো ঘাসের ওপর দিয়ে যে পায়ে-চলা পথ, তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি মানুষ। দুটো হাত সামনের দিকে ছড়ানো। আর মানুষটার শরীরের পাশে নেতিয়ে আছে সাপটা। বোঝা যাচ্ছে গুলির যে শব্দটা হয়েছিল সেইটে ওর মাথা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, এখনও তার লেজটা নড়ছে, নড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল সায়নের কাছে। অশ্বারোহীর দলটা এদিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। সাপটা এই লোকটাকে আক্রমণ করে। চিৎকার হওয়ামাত্র ওর বন্ধুরা সাপটাকে গুলি করে মেরে ফেলে। এবং মৃত সহকর্মীর ওপরে সামান্য সহানুভূতি না জানিয়ে ওরা তাকে এখানে ফেলে চলে যায় নিজেদের কাজে। মানুষগুলো কতটা নির্মম তা আর আন্দাজ করতে পারছিল না সায়ন। তবে সাপটার বিষের প্রতিক্রিয়া যে কতখানি তা বুঝে শিউরে উঠল সে। কে যেন একবার তাকে বলেছিল, সাপ কামড়ালে অন্তত আধঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাপটা দু-তিন মিনিটের বেশি সময় দেয়নি।

আলো কমে আসছিল। সময় আন্দাজ করা জঙ্গলের ভেতরে বেশ মুশকিল। ঘুমিয়ে নিয়ে সায়নের বেশ তাজা লাগছিল শরীর। হঠাৎ তার কৌতূহল হল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটার কাছে এগিয়ে গেল সে। এর মধ্যে শরীর নীল হতে শুরু করেছে। কোনওরকমে চিত করে শুইয়ে দিতেই ন্যাড়া মাথাটা দেখতে পেল। লোকটাও নিশ্চয়ই ওর বন্ধুদের মতো নির্মম ছিল। এবং তখনই তার নজরে পড়ল ওর কোমরে গোঁজা রিভলভারের খাপটা। একটা বেল্টের সঙ্গে বাঁধা আছে। সায়ন কোনওকিছু চিন্তা না করে দ্রুত কোনওরকমে বেল্টটা খুলে নিল। কোনওদিন রিভলভার চালায়নি সে। কিন্তু বেল্টের সঙ্গে বাঁধা খাপে গোটা-ছয়েক গুলি আছে। আর এই জঙ্গলে মৃত্যু তো যেখানে-সেখানে। কোমরে রিভলভারসুদ্ধ বেল্টটাকে বেঁধে সে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটার ওপরে। সন্ধের আগেই একটা ফাঁকা জায়গায় যাওয়া দরকার তার। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

আজ প্রমিস ব্যবহার ক'রে হাজার হাজার পরিবার চিরকালের ব্যবহৃত
লবঙ্গ তেলের
গুণ তো বুঝছেন!
প্রমিস
আপনিও দেখুন না ব্যবহার ক'রে?

প্রমিস
- দাঁতের ক্ষয় রোধ করে,
- মুখে আনে সুস্বাদ, আর
- দূর করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বিশ্বের স্বর্ণপদক বিজয়ী

সুস্থ-সবল দাঁত ও মাড়ি আর নির্মল
শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য

বালসারা উৎপাদন

CHAITRA-BLS-668 BEN.

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : শার্লক হোমসের সঙ্গে বস্কোম্ব ভ্যালিতে এসেছে ওয়াটসন। সেখানে জন টার্নারের ভাড়াটে চার্লস ম্যাকার্থি ঝিলের ধারে খুন হয়েছেন। ঘটনার আগে চার্লসের ছেলে জেমসকে নাকি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখা গিয়েছিল। পুলিশ জেমসকে গ্রেফতার করে। করোনারকে জেমস জানায়, একটা সাংকেতিক ডাক—যা শুধু তার ও তার বাবার মধ্যে চলত—শুনে সে ঝিলের ধারে ছুটে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে কী নিয়ে তার কথা হয়েছিল, তা সে বলতে নারাজ। সকলের বিশ্বাস, সে-ই খুনি। যারা মনে করে সে নির্দোষ, টার্নারের মেয়ে তাদেরই একজন। ইনসপেক্টর লেস্ট্রেডের সঙ্গে হোমস গেলেন জেমসের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর···

আমি ওদের স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম। তারপর ঘরে ফিরে একটা রহস্য-উপন্যাস পড়তে লাগলুম। খানিকক্ষণ পরে বইটা ভীষণ জোলো মনে হল। জীবনে যে-সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা হয়, তার কাছে গল্পের রহস্য কোথায় লাগে। আরও কিছুক্ষণ পরে আমার খেয়াল হল যে, আমার চোখ দুটো বইয়ের পাতায় থাকলেও মনে মনে আমি ম্যাকার্থিকে খুন করার ব্যাপারটাই ভাবছি। বইটা রেখে দিলুম। যদি জেমসের কথা সত্যি হয়, তা হলে সে তার বাবার কাছ থেকে চলে আসবার পর আর বাবার চিৎকার শুনে ছুটে যাওয়ার মধ্যে ওই অল্প সময়টুকুতে এমন কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে থাকতে পারে? কীভাবে জেমসের বাবার মৃত্যু হল? কে তাকে খুন করল? কীভাবে করল? কেন করল? হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ম্যাকার্থির মাথার ঠিক কোন্ জায়গায় কীরকম আঘাত লেগেছে সেটা আমার ডাক্তারি বিদ্যে দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে কি কোনও সূত্র পাওয়া যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে ওখানকার যে সাপ্তাহিক কাগজে সব খবর বেরিয়েছিল, সেটা আনতে বললুম। কাগজ পড়লুম। পুলিশের ডাক্তার বলেছেন যে, খুব ভারী অথচ ভোঁতা কোনও কিছু দিয়ে মাথার পিছন দিকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করায় পাইরেটাল আর বাঁ দিকের অক্সিপেটাল হাড় দুটো চুরমার হয়ে গেছে। আমি মাথার পেছনে হাত দিয়ে জায়গা দুটো দেখে নিলুম। একটা জিনিস খুব পরিষ্কার। আঘাতটা করা হয়েছে পিছন থেকে। এটা জেমসের পক্ষে একটা প্রমাণ। কেননা যখন কথা-কাটাকাটি চলছিল, তখন জেমস আর তার বাবা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। অবশ্য এটা খুব একটা অকাট্য প্রমাণও নয়। কেননা এমনও হতে পারে যে কথা-কাটাকাটির মাঝখানে জেমসের বাবা উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। তবু আমার মনে হল যে, কথাটা হোমসকে বলা দরকার। তারপর ওই র‍্যাটের ব্যাপারটাই বা কী? জেমসের বাবা কি ভুল বকছিলেন? কিন্তু মাথায় ওই ধরনের আঘাত লাগলে আহত ব্যক্তি কোনও মতেই ভুল বকবে না। তাই মনে হয় যে ওই র‍্যাট শব্দের মধ্যে দিয়ে ম্যাকার্থি নিশ্চয়ই কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি? আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলুম। আরও একটা কথা আমার মনে পড়ল। জেমস যে ছাই রঙের কাপড়টা ঘটনাস্থলে পড়ে থাকতে দেখেছিল, সেটাই বা কী? যদি এটা ধরে নিই যে, ওটা খুনিরই কোট বা ওভারকোট আর জেমস যখন তার বাবার মৃতদেহের পাশে বসে ছিল, তখনই খুনি চুপিসারে এসে ওই জামাটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তা হলে মানতেই হবে যে খুনি যেমন সাহসী তেমনি ক্ষিপ্র। তবে কথা হচ্ছে, জেমসের এ কথাটা সত্যি কি না। লেস্ট্রেডের কথা শুনে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। সহজ বুদ্ধিতে ওদের কথাই ঠিক বলে মনে হয়। তবে শার্লক হোমসের ওপর আমার এতই আস্থা যে এসব সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হোমস জেমসকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে।

হোমস যখন ফিরে এল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। লেস্ট্রেড তার ডেরায় ফিরে গেছে। হোমস একলাই হোটেলে ফিরে এল।

একটা চেয়ারে বেশ আরাম করে হাত-পা মেলে বসে হোমস বলল, "আমরা ঘটনাস্থলে যাবার আগে যেন বৃষ্টি না হয়। মুশকিল হচ্ছে, ঘটনাস্থল ভাল করে দেখতে গেলে সুস্থ শরীর আর চাঙ্গা মন নিয়ে দেখতে হয়। সারাদিন ট্রেন জার্নি করে ওখানে আমি যেতে চাইনি।···আমার সঙ্গে জেমস ম্যাকার্থির দেখা হল।"

"ওর কাছ থেকে কী খবর পেলে?"

"কিছুই নয়।"

"এমন কিছু বলতে পারলে না যার থেকে ব্যাপারটার ফয়সালা হতে পারে?"

"নাহ্। আমার গোড়ায় ধারণা হয়েছিল যে কে খুন করেছে সেটা ও জানে। আর যে-কোনও কারণেই হোক খুনিকে ও বাঁচাতে চাইছে। কিন্তু পরে দেখলুম তা নয়। গোটা ব্যাপারটায় ও নিজেও খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছে। জেমস ছোকরা এমনি যে খুব বুদ্ধিমান তা নয়, তবে ওর মনটা খুব ভাল।"

তারপর একটু থেমে হোমস বলল, "ম্যাকার্থিদের পয়সাকড়ি বিশেষ কিছুই নেই। জেমসের বাবার মতলব ছিল মিস টার্নারের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়ার। তা হলে আর টাকা-পয়সার ভাবনা থাকবে না। কিন্তু জেমসের তাতে মন নেই। জেমস মিস টার্নারকে নিজের বোনের মতো ভালবাসে। এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। জেমস আকাশে দু'হাত তুলে ভগবানের দিব্যি করে বলেছিল যে এ-কথা সে মানতে পারবে না।"

"কিন্তু জেমস যদি খুন না করে থাকে তবে খুন করল কে?"

"তাই তো। কে করল খুন? আমি দুটো ব্যাপার তোমাকে লক্ষ করতে বলছি। প্রথমত দ্যাখো, নিহত ব্যক্তির কারও সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। কিন্তু সে লোক তার ছেলে নয়।

ছেলে যে ফিরে এসেছে তা সে জানতই না। তার পর সে একবার 'কুইই' বলে হাঁক পেড়েছিল। কিন্তু তখনও সে জানত না যে, তার ছেলে ফিরে এসেছে। আচ্ছা...এবার অন্য কথা বলা যাক।"

হোমসের মনের আশা পূর্ণ করে সে রাতে বৃষ্টি হল না। সকালবেলা পরিষ্কার ঝকঝকে রোদ। আকাশে মেঘ নেই। ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় ন'টার সময় লেস্ট্রেড গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হল। আমরা তার সঙ্গে বস্কোম্ব ঝিল আর হেদারলি ফার্মে যাব বলে বার হলুম।

যেতে-যেতে লেস্ট্রেড বলল, "আজ সকালে একটা খারাপ খবর আছে। মিঃ টার্নারের শরীর খুবই খারাপ হয়েছে। বাঁচবেন কি না সন্দেহ।"

"ভদ্রলোকের বয়েস কত হবে?"

"পঁয়ষট্টির কাছাকাছি হবে। তবে বিদেশে থাকার সময়েই ওঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। ইদানীং তো ওঁর স্বাস্থ্য একদম ভেঙে গেছে। তারপর এই ব্যাপারটায় উনি ভীষণ 'শক' পেয়েছেন। ওঁর সঙ্গে ম্যাকার্থির অনেক দিনের বন্ধুত্ব। দু'জনের মধ্যে এত ভাব যে উনি ম্যাকার্থিকে বিনা ভাড়ায় হেদারলি ফার্মে থাকতে দিয়েছেন।"

"তাই নাকি! তাই নাকি!" হোমস বলে উঠল।

"হ্যাঁ, শুধু তাই নয়। আরও অনেক ভাবে উনি ম্যাকার্থিদের সাহায্য করেছেন। এ-সব কথা এখানকার সকলেই জানে।"

"বটে! লেস্ট্রেড, একটা জিনিস লক্ষ করুন। ম্যাকার্থির পয়সাকড়ি ছিল না। অনেক ব্যাপারেই তাকে টার্নারের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হত, তা সত্ত্বেও কেন তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে টার্নারের মেয়ের, যে কিনা একসময়ে এই বিরাট সম্পত্তির মালিক হবে, বিয়ের কথা বলতেন। সাধারণভাবে এটা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না? এটা থেকে আপনি কিছু অনুমান করতে পারছেন?"

"অনুমান....সিদ্ধান্ত...." বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে লেস্ট্রেড আমার দিকে চোখ টিপে বলল, "এসবের চেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে তথ্য, ফ্যাক্টস। ঘটনা আর তথ্যকে সামাল দিতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। অনুমান আর সিদ্ধান্ত কল্পনা করে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই।"

হোমস খুব নিচু গলায় বলল, "আপনি ঠিক বলেছেন। ঘটনাগুলোর তাৎপর্য বোঝাই আপনার পক্ষে শক্ত।"

বেশ একটু রেগে গিয়ে লেস্ট্রেড বললেন, "কিন্তু একটা ঘটনার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝেছি, যেটা আপনি এখনও ধরতে পারেননি।"

"সেটা কী?"

"সেটা হল এই যে, জেমস ম্যাকার্থি তার বাবাকে খুন করেছে। এ ছাড়া আর সব কিছুই মিথ্যে আকাশ-কুসুম কল্পনা করা।"

হোমস হেসে বলল, "কিছু না করার চাইতে কখনও কখনও কল্পনা করাও ভাল। যাকগে, আমাদের বাঁ দিকের ঐ বাড়িটাই বোধহয় হেদারলি ফার্ম।"

"হ্যাঁ। ওইটেই হেদারলি ফার্ম বটে।"

বেশ বড় বাড়ি। দোতলা। দেওয়ালের জায়গায়-জায়গায় শ্যাওলার ছোপ ধরেছে। বাড়িটার জানলা-দরজা সব বন্ধ। চিমনি দিয়েও ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। দেখলে মনে হয় যেন বাড়িটাও শোকের ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি। আমরা কলিং-বেল বাজাতে একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল। হোমস তাকে ম্যাকার্থি খুন হওয়ার সময় যে জুতোটা পরে ছিলেন সেটা আর জেমস ম্যাকার্থির একজোড়া জুতো আনতে বলল। অবশ্য জেমস সেই সময়ে যে জুতোজোড়া পরে ছিল সেটা পাওয়া গেল না। তারপর হোমস একমনে জুতো পরীক্ষা করতে লাগল। সাত-আট রকম ভাবে জুতোগুলো মাপতে লাগল। যখন তার জুতো পরীক্ষা করা শেষ হল, তখন সে যে রাস্তা ধরে ম্যাকার্থি বস্কোম্ব ঝিলের দিকে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরে চলতে শুরু করল।

তদন্ত করবার সময়ে হোমস যখন কোনও সূত্রের সন্ধান পেয়ে যায় তখন তার মধ্যে একটা আশ্চর্যরকম পরিবর্তন দেখা যায়। যাঁরা বেকার স্ট্রিটের চেয়ারে বসে থাকা প্রায় পি-পু-ফি-শু ধরনের লোকটিকে শার্লক হোমস বলে জানেন, তাঁরা এই হোমসকে চিনতেই পারবেন না। তার মুখটা উত্তেজনায় থমথম আর লালচে হয়ে ওঠে। ভুরু দুটো টানা আর ছুঁচোলো হয়ে যায়। চোখ দুটো এমন চকচক করে যে, মনে হয় তার থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে, ঠোঁট দুটো চেপে সে অসম্ভব ক্ষিপ্রভাবে চলাফেরা করে। এই সময়ে সে এত গভীরভাবে চিন্তা করে যে, কেউ কোনও কথা বললে হয় সেটা তার কানেই যায় না, নয়তো এমন বিরক্ত হয়ে খেঁকিয়ে ওঠে যে তা বলবার নয়।

কোনও কথা না বলে খুব দ্রুত পায়ে হোমস সেই পথে মাঠ পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বস্কোম্ব ঝিলের দিকে এগিয়ে চলল। স্যাঁতসেঁতে জলা জায়গা। সেখানে মাটিতে অনেক লোকের পায়ের ছাপ পড়েছে। পায়ের ছাপ শুধু রাস্তাতেই নেই, আশপাশের ঘাসের ওপরেও অসংখ্য পায়ের দাগ। হোমস কোথাও-কোথাও দৌড়ে যাচ্ছিল, আবার কখনও-কখনও কোনও একটা জায়গায় এসে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। একবার তো হোমস মাঠের উলটো দিকে খানিক দূর চলে গিয়ে ঘুরে এল। লেস্ট্রেড আর আমি হোমসের পিছু-পিছু হাঁটা দিলুম। লেস্ট্রেডকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, হোমসের কাজকর্মকে মনে-মনে সে খুবই তাচ্ছিল্য করছিল। তবে আমার ব্যাপারটা আলাদা। আমি সমস্ত কিছু খুব মন দিয়ে দেখে যাচ্ছিলুম। আমি জানি যে হোমস এখন যা করছে তার প্রত্যেকটির পিছনে একটা কার্যকারণ যোগ আছে।

বস্কোম্ব ঝিল হেদারলি ফার্ম আর মিঃ টার্নারের বাগানের মাঝখান বরাবর। ঝিলটা চওড়ায় প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে। ঝিলের ওপারে বড়-বড় গাছ। গাছের ওপর দিয়ে মিঃ টার্নারের বাড়ির লাল চুড়োটা দেখা যাচ্ছিল। ঝিলের জলে প্রচুর নলখাগড়া হয়েছে। হেদারলি ফার্মের দিকে খানিকটা জায়গা বেশ জঙ্গলের মতো। সেই জঙ্গলের আর ঝিলের মাঝখানে খানিকটা ঘাসে ঢাকা জায়গা। যে-জায়গায় ম্যাকার্থির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল লেস্ট্রেড সে জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিল। জায়গাটায় এমন জলকাদা যে ম্যাকার্থি পড়ে যাওয়ায় সেখানে একটা ছাঁচের মতো হয়ে গিয়েছিল। হোমসের দিকে তাকাতে বুঝলুম যে এই জল, কাদা, ঝোপ-জঙ্গল আর ঘাসের ভেতরে আমি যা দেখেছি, তার চোখ তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু দেখেছে। হোমস

শিকারি কুকুরের মতো একবার এখানে আর একবার ওখানে ছোটাছুটি করছিল।

"আপনি ঝিলে কী করতে নেমেছিলেন?" হোমস লেস্ট্রেডকে জিজ্ঞেস করল।

"আমি একটা ডিঙি-নৌকো নিয়ে দেখছিলুম যে অস্ত্র দিয়ে ম্যাকার্থিকে খুন করা হয়েছে সেটা পাওয়া যায় কি না। কিন্তু সে-কথা আপনি কেমন করে—"

"আরে ছাড়ুন তো বাজে কথা। আপনার বাঁকা বাঁ পায়ের ছাপ সব জায়গায় পড়েছে। এ তো নেহাত অন্ধ ছাড়া কারও চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু ওই ষাঁড়ের দল এসে পড়বার আগে যদি আমি এখানে আসতে পারতুম কী ভালই না হত! এখানেই জেমস আর পেসেন্সের বাবা তার দলবল নিয়ে এসেছিল। এখানে ছ' সাত জোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। এই জায়গাটায় দেখছি একই পায়ের ছাপ তিনবার পড়েছে।" হোমস পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে নিজের ওয়াটারপ্রুফটা পেতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর নিজের মনেই কথা বলতে লাগল। 'এগুলো হচ্ছে জেমসের পায়ের ছাপ। দু'বার সে হেঁটেছে। একবার জোরে ছুটেছে। চেটোর দাগটা গভীর হয়ে পড়েছে। গোড়ালির ছাপ নেই। বোঝা যাচ্ছে যে, ও সত্যি কথাই বলেছে। ওর বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে ও ছুটেছিল। এইখানে ওর বাবার পায়ের দাগ। ভদ্রলোক ওই জায়গাটায় পায়চারি করেছেন। এটা কী? এটা তো বন্দুকের কুঁদোটার ছাপ। বন্দুকটা-এইখানে রেখে জেমস ওর বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। এটা কী? তাই তো, তাই তো! এখানে এগুলো কী? পা টিপে টিপে কেউ গেছে। চৌকো ধরনের একটু অদ্ভুত আকারের জুতো। একবার এদিকে এসেছে, তার পর ফিরে গেছে, আবার এসেছে। শেষবার অবশ্য জামাটা নিতেই এসেছিল। কিন্তু সে এল কোন্ দিক থেকে?'

হোমস এদিক-ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলে। কোথাও কোথাও সে পায়ের দাগ খুঁজে পাচ্ছিল না। আবার এক-এক জায়গায় পায়ের দাগ বুঝতে পারছিল। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে হোমস সেই ঝিলের পাশে ছোটখাটো জঙ্গলটার একধারে এসে পড়ল। সেখানে একটা বিরাট বিচগাছ। অত বড় গাছ আশেপাশে আর কোথাও নেই। হোমস সেই গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। তারপর মুখ দিয়ে একটা শব্দ করল। বুঝলুম কোনও কারণে সে খুব খুশি হয়েছে। বেশ কিছুটা সময় হোমস সেইখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা কাঠি দিয়ে সেইখানে পড়ে থাকা শুকনো পাতা, ফুল, কাঠকুটো উলটে-পালটে দেখতে লাগল। তারপর সেখান থেকে যত্ন করে, ধুলো বলেই আমার মনে হল, কী যেন একটা খামে পুরে ফেলল। এর পর ম্যাগনিফাইং লেন্স দিয়ে কেবল মাটিই নয়, গাছের ছালও ভাল করে দেখতে লাগল। গাছটার যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় ততটাই হোম্স দেখলে। কাছেই একটা এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঙড় পড়ে ছিল। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে হোমস সেটাকে তুলে নিল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে সরু পায়ে-চলা পথটা চলে গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে-হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

হোমস বলল, "ম্যাকার্থি খুনের তদন্তটা খুবই ইন্টারেস্টিং।" এখন হোমসের চেহারাটা স্বাভাবিক হয়ে

এসেছে। "ওই ছাই-ছাই রঙের বাড়িটা বোধহয় পেসেন্সদের বাড়ি। আমি একবার পেসেন্সের সঙ্গে দেখা করব। তারপর একটা ছোট চিঠি লিখব। ব্যস, এই কাজটুকু সেরেই আমরা লাঞ্চ সারতে যাব। ওয়াটসন আর আপনি বরং ততক্ষণ গাড়িতে গিয়ে বসুন।"

মিনিট-দশেকের মধ্যেই হোমস ফিরে এল। তার হাতে তখনও সেই পাথরটা ধরা ছিল।

পাথরটা লেস্ট্রেডকে দেখিয়ে হোমস বলল, "লেস্ট্রেড, এই পাথরটা দিয়েই ম্যাকার্থিকে খুন করা হয়েছিল।"

"আমি তো কোনও দাগ দেখতে পাচ্ছি না।"

"কোনও দাগ তো নেই।"

"তা হলে কী করে জানলেন?"

"এই পাথরটার নীচে ঘাস গজিয়েছিল। এটা অল্পদিন হল ওইখানে রয়েছে। কিন্তু এটা যে কোথা থেকে আনা হয়েছিল, তা খুঁজে পেলুম না। ম্যাকার্থির মাথায় যেরকম আঘাত তা পাথরটার আকারের সঙ্গে মিলে যায়। এ ছাড়া আর কোনও অস্ত্র ওখানে নেই।"

"খুনির পরিচয়টা কী?"

"খুনি খুব লম্বা। ন্যাটা। তার ডান পা খোঁড়া। তার পায়ে শিকারিরা যে রকম পুরু সুকতলা-লাগানো জুতো পরে সেই রকম জুতো ছিল। তার গায়ে ছাই রঙের কোট ছিল। লোকটা সিগার খায়। সিগার-হোল্ডার ব্যবহার করে। তার পকেটে ভোঁতা পেন্সিল-কাটা ছুরি ছিল। এ ছাড়া আর কিছু-কিছু কথা বলা যায়। তবে যে কটা কথা বললুম, তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে।"

লেস্ট্রেড হাসল। "আমি কিন্তু আপনার কথা মানতে পারছি না। এসব অনুমান সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। তবে আমার সমস্যা হল এই যে, আমাকে মাথামোটা ব্রিটিশ জুরিদের বোঝাতে হবে।" (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধাঁধা

সেজোদাদু আজ সকাল থেকেই ছোট্‌কাকে নিয়ে মজা করছেন। কী, না ছোট্‌কা নাকি আন্তর্জাতিক।

দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে ছোট্‌কার লুচি-আলুর দম খাওয়া চাই, ঈদের দিন বিরিয়ানি, এবং বড়দিনে কেক ছাড়া চলবেই না। আর এই খাওয়া নিয়েই সেজোদাদুর মজা-করা।

কথাটা অবশ্য সেজোদাদু কেক-সহযোগে চা খেতে-খেতেই বললেন। ছোট্‌কারই কিনে-আনা কেক। চমৎকার স্বাদ, আকারেও বিশাল।

সেই বিশাল কেকের টুকরো মুখে পুরে সেজোদাদু বললেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাকি বলে গেছেন যে, বড়দিন আনন্দ করবার দিন নয়, আজ পরিতাপ করার দিন।

আর সেই লেখাটারই খেই ধরে ছোট্‌কা আমায় এমন দু-একটা ধাঁধা দিল, যা বড়দিনের ধাঁধাই বলা যায়। ছোট্‌কার ধাঁধায় একটা অঙ্কও ছিল। আমি সেটা দেখে একটু আপত্তি করেছি। আজ আবার অঙ্ক কেন। তা ছাড়া, এবারের বার্ষিক পরীক্ষায় আমার অঙ্কের নম্বর তো অন্যবারের চেয়ে অনেক অনেক ভাল। তা হলে অঙ্ক কেন।

তার উত্তরে ছোট্‌কা কী করল জানো? বইয়ের তাক থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটা খণ্ড বার করল। খুঁজে-খুঁজে সেটা থেকে একটা পৃষ্ঠা বার করে আমার সামনে ধরল। সেই লেখাটার মধ্যে সেজোদাদুর বলা কথাটা রয়েছে। আর লেখা রয়েছে—'বড়দিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নম্র করবার দিন।'

লেখাটা দেখিয়ে ছোট্‌কা বলল, "সুতরাং পরীক্ষা হয়ে যাক।"

প্রথম ধাঁধা ॥ নীচের শব্দটার জট ছাড়াও। ছাড়ালে পাবে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম। সেই কবিতাটি কাকে নিয়ে লেখা সেটাও বলতে হবে।

পুবনমাত্র

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ নীচের অঙ্কটার সাঙ্কেতিক চিহ্নের জায়গায় উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

$$\begin{array}{r} A\ B\ C\ D\ E \\ \times\ 4 \\ \hline E\ D\ C\ B\ A \end{array}$$

তৃতীয় ধাঁধা ॥ আজ থেকে কত বছর আগে জন্মেছিলেন যিশুখ্রিস্ট?

গতবারের উত্তর ॥ (১) পাঁচটি স্টপে। (২) যখন 'ভুল'কে 'ভূল' বানায়। (৩) $৯৯\frac{৯৯}{৯৯}$

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১			■	২		৩
	■	■	৪	■	■	
	■	৫		৬	■	
■	৭					■
৮	■	■		■	■	৯
	■	১০		১১	■	
১২			■	১৩		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পাহারাদার। (২) স্বর্গমর্ত্য। (৫) বনে জাত। (৭) এশিয়া মহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে যে অঞ্চল। (১০) যে চালায়। (১২) চিনি। (১৩) রবীন্দ্রনাথের লেখা বিখ্যাত বই।

উপর-নীচ : (১) পশ্চিম দিক। (৩) সূচীকর্ম। (৪) বনে থাকে বাঘের মামা-মাসি। (৫) যত পড়ি তত শিখি। (৬) কোনও-কোনও শাড়ি বা ধুতি-কাপড়ে থাকে। (৮) মেটে রঙ। (৯) মালা, ওলটালে মালিন্য। (১০) কচি গাছ বা কচি মাছ। (১১) কুঁড়ি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

র	বা	ব	■	ব	হি	ত্র
ক্ত	■	■	অ	■	ম	■
ক	■	■	হি	রো	শি	মা
র	ক	■	তু	■	ম	ন
বী	র	খ	ণ্ডি	■	■	ম
■	বা	■	ক	■	■	ন্দি
গু	ল	তি	■	গা	ন্ধা	র

রঞ্জন

মজার খেলা

তিন টুকরো কাগজ আর একটা কলম—এই লাগবে এবারের খেলার জন্য। কাগজগুলো সাদা হলেই ভাল, আর যদি একটু মোটা হয় তা হলে তো কথাই নেই। ভিজিটিং কার্ড তিনটে জোগাড় করে নিতে পারো। তা হলে কার্ডগুলোর উলটো পিঠের সাদা দিকটা কাজে লাগানো যাবে।

এবার কী করতে হবে, বলি।

প্রত্যেকটা কার্ডে একটা করে ত্রিভুজের ছবি আঁকবে, আর ত্রিভুজের মধ্যে লিখবে নীচের কথাগুলো। ঠিক যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই লিখবে। ভুল মনে হলেও দ্বিধা করবে না। কেননা ইচ্ছে করেই ভুলগুলো রাখা।

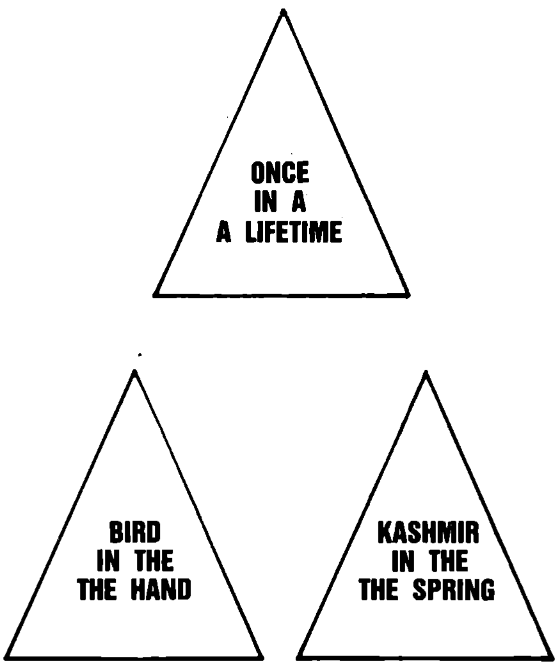

একটু নজর করলেই দেখতে পাবে, প্রত্যেকটা ত্রিভুজের মধ্যে ইচ্ছে করে এক-একটা শব্দ দু-বার করে লেখা হয়েছে। তুমি কিন্তু দু-বারই লিখবে। ঠিক করে নিয়ো না। তা হলে মজাটাই মাটি।

কেননা, খেলাটা হচ্ছে এইরকম। প্রত্যেক বন্ধু একবার করে তিনটে কার্ড দেখবে। তারপর অন্য কাগজে, কাউকে না বলে, যা দেখল হুবহু তাই লিখবে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, কার্ডগুলো হাতে নিয়ে বন্ধুরা যা লেখা আছে তা পড়ে শোনাবে।

আর তখনই হবে আসল মজা। দেখবে, সবাই ঠিক পড়ছে, অর্থাৎ যা হলে ঠিক হত, তাই পড়ছে, কিংবা তাই-ই লিখছে। ভুল যে রয়েছে সেটা চোখেই পড়ছে না কারও। অথচ ঠিক পড়াটাই তো ভুল পড়া, ঠিক লেখাটাই ভুল লেখা—এই মজার খেলায়।

মজারু

হাসিখুশি

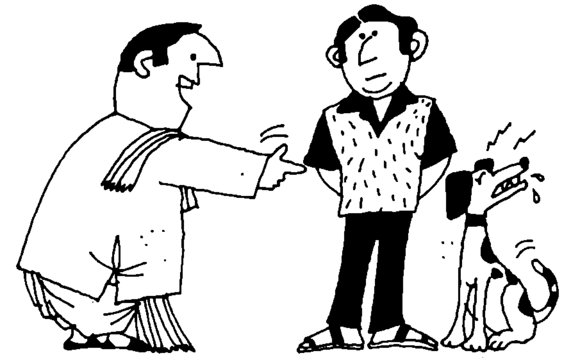

"তোমাদের বাড়ির কুকুরটা আমাকে দেখলেই যা ঘেউ ঘেউ করে, ভয়ে ভিতরে যেতেই পারি না।"

"যে-কুকুর ঘেউঘেউ করে, সে কামড়ায় না।"

"মানলাম, কিন্তু কুকুরটা কি ওই প্রবাদটা জানে ?"

"টাকা-পয়সার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলোচনা করাই বৃথা। তুমি দেখছি একেবারেই আনাড়ি।"

"তাই বুঝি ? আমি চলে যাবার পর তোমার ক্যাশ-বাক্সটা খুললেই কিন্তু ধারণা পালটে যাবে।"

"কী ব্যাপার রমেশবাবু, শুনলাম আপনি নাকি শহরের সমস্ত দোকান থেকে পচা ডিম, টমেটো কিনে নিচ্ছেন ?"

"ঠিকই শুনেছেন। কাল বিনোদন-কেন্দ্রে যে আমার গানের অনুষ্ঠান।"

"আপনার হোটেলের সুপের মধ্যে মরা পিঁপড়ে। এ আমি খাব না।"

"দু' টাকার সুপের মধ্যে কি মরা হাতি পাবেন স্যার ?"

"বিদেশে ব্যবসা করে কতদিন পরে দেশে ফিরলে। তা কত নিয়ে ফিরলে হারাধন ?"

"পঁচিশ হাজার টাকা।"

"বা বা, এই তো চাই।"

"আরে, পুরোটা তো শুনলেই না। নিয়ে গিয়েছিলাম যে পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

ছবি : দেবাশিস দেব

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"

— ফেভি ফেয়ারী

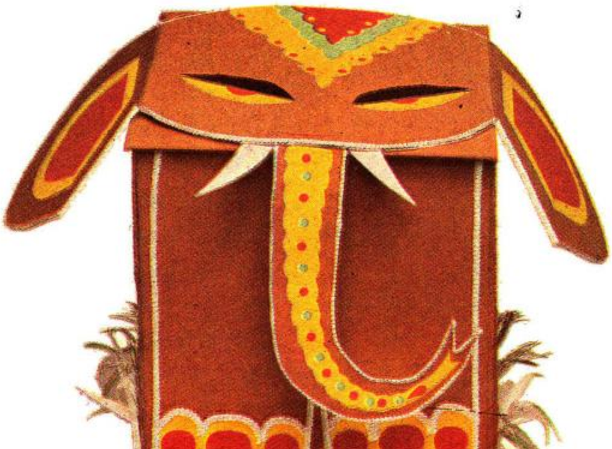

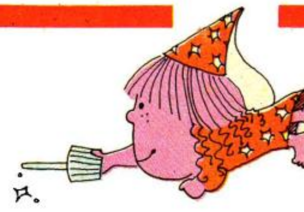

চটপট করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি–বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

বিনামূল্যে, জিম্বো দি জাম্বো কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য এই কুপনটি **পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০**

টুকরো কাগজগুলো জমা ক'রে জাম্বো আপনার ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

OBM/6379 BN

বিনামূল্যে, জিম্বো দি জাম্বো কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন:
"ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম :______________________

বয়স :______________________

ঠিকানা :______________________

শহর :______________________

রাজ্য :____________ পিনকোড :____________ (A)

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফ্‌ট পত্রিকাটি পেয়েছেন ? হাঁ/না

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহেসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি আর **ফেভিকল** ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

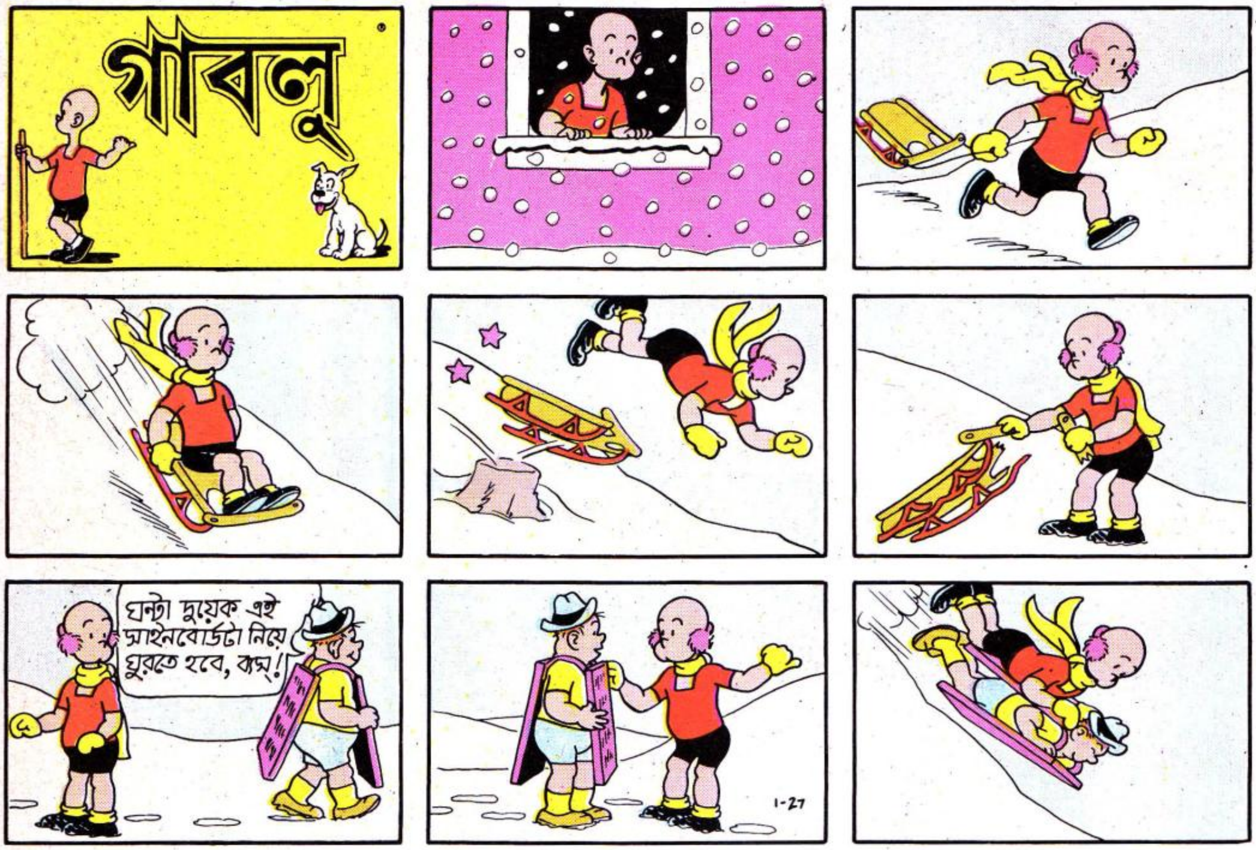
গাবলু
ঘন্টা দুয়েক এই সাইনবোর্ডটা নিয়ে ঘুরতে হবে, ব্যস্!
1-27

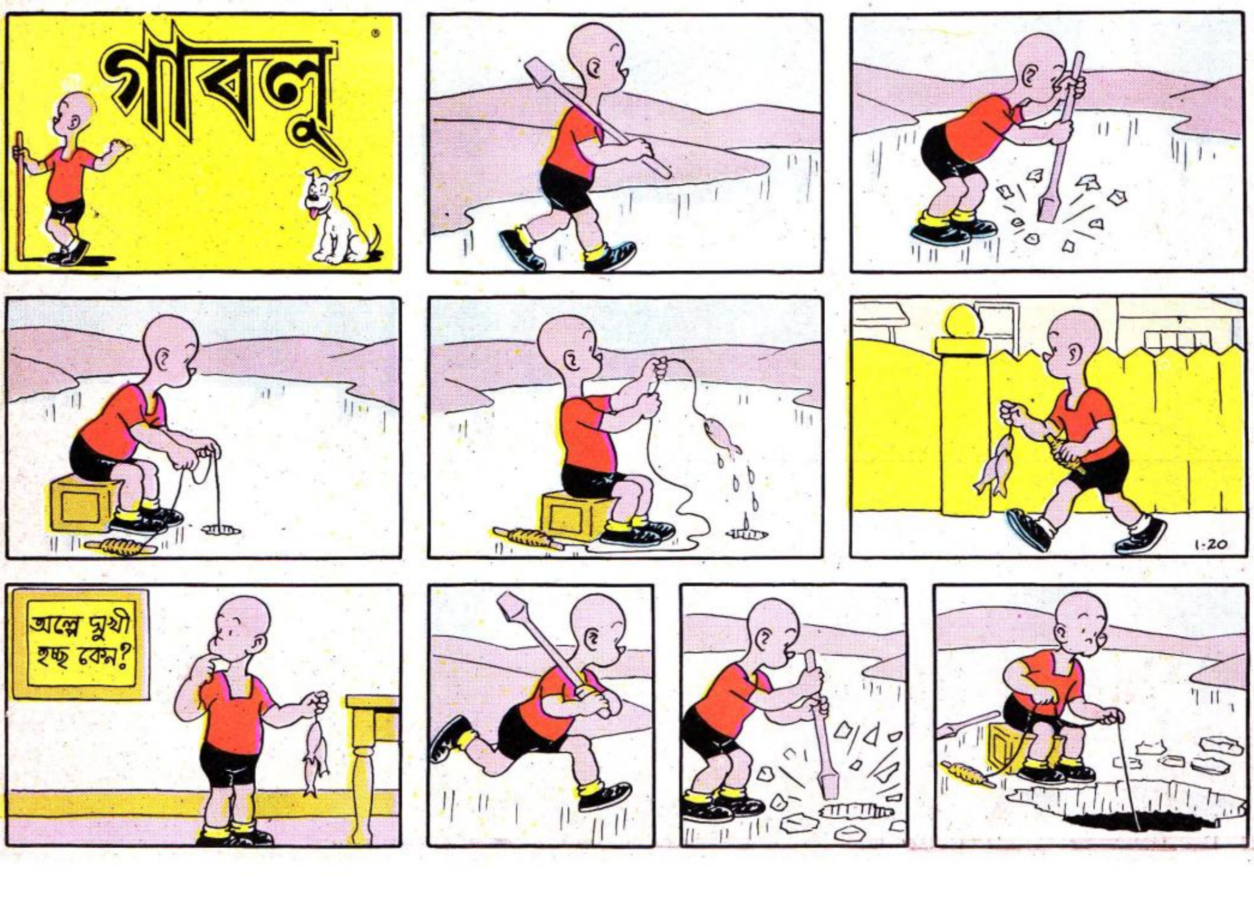
গাবলু
1-20
অল্পে সুখী হচ্ছ কেন?

রথম্যানস কাপ জিতল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

সম্রাট রায়

রাজার মাথা থেকে খসে পড়ল মুকুট। একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ভারত হেরে গেল রথম্যানস কাপে, প্রথমে পাকিস্তান, পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে। '৮৩-র প্রুডেনশল্ কাপে ভারতের হাতে ফাইনালে পরাজয়ের বদলা নিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শেষ ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে। যেভাবে ভারত পর পর দুটো ম্যাচে হারল, তার থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল, একদিনের ক্রিকেটের গৌরবের চুড়ো থেকে এবার বোধহয় ভারতের অনিবার্য পতনের শুরু।

রথম্যানস কাপে ছিল তিনটি দেশ, গতবারের চ্যাম্পিয়ান ভারত, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মুখোমুখি হয় পাকিস্তানের। টস জিতে পাক-অধিনায়ক ইমরান ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় দু'-একটি ভুরু ছিট্‌কে উঠেছিল ওপর দিকে। কারণ, সাধারণ সীমায়িত ওভার ক্রিকেটে অধিকাংশ দলই বিপক্ষের রান দেখে নিয়ে অর্থাৎ সামনে একটা টার্গেট রেখে পরে ব্যাট করতে নামে। ইমরানের সিদ্ধান্ত অবশ্য পাকিস্তানকে বিপাকে ফেলেনি। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে তারা মহসিন

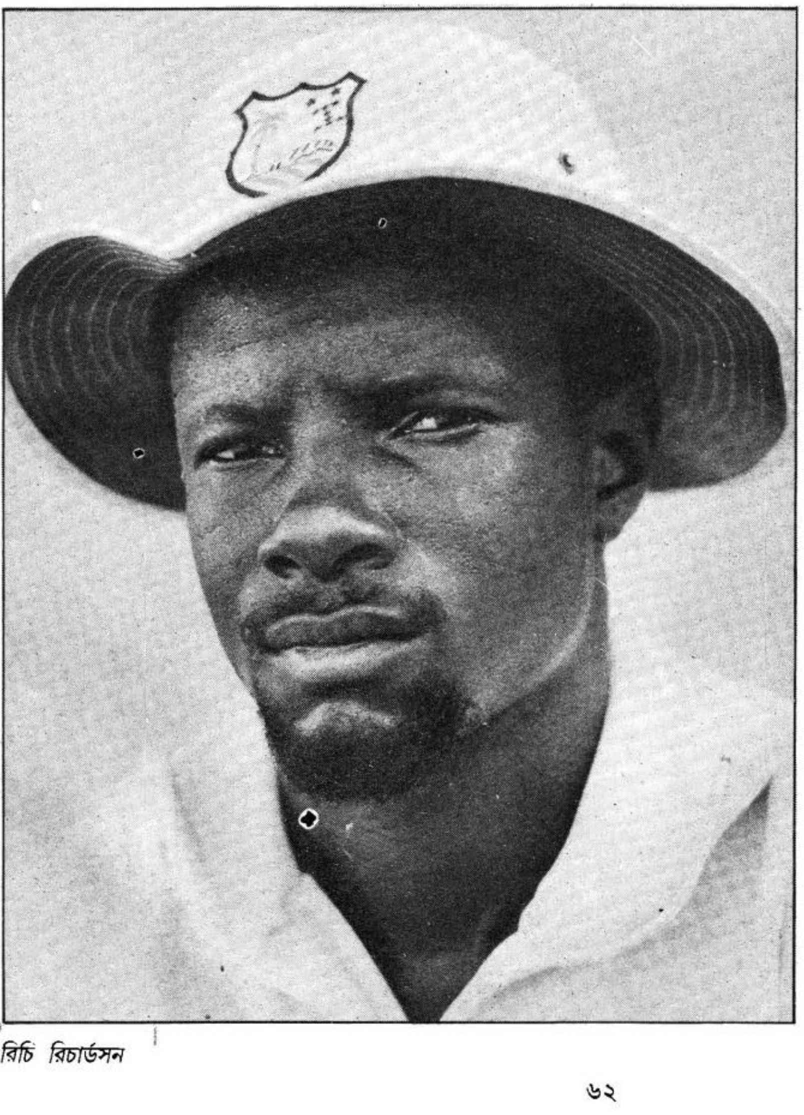

রিচি রিচার্ডসন

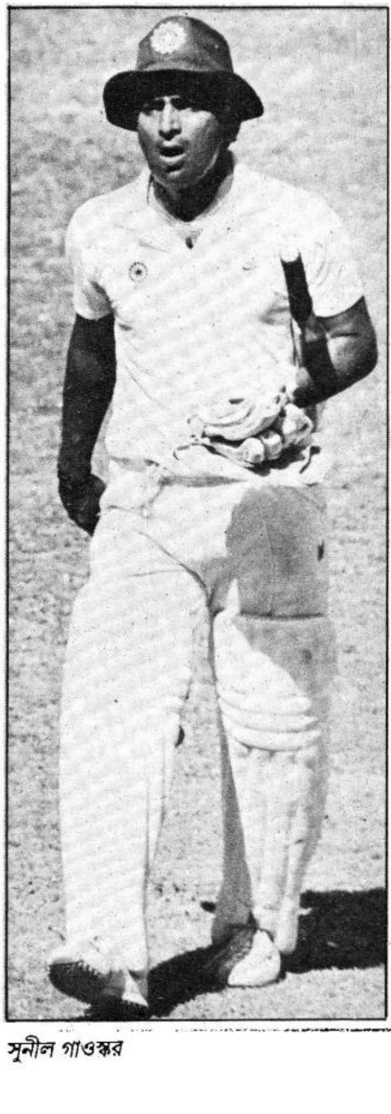

সুনীল গাওস্কর

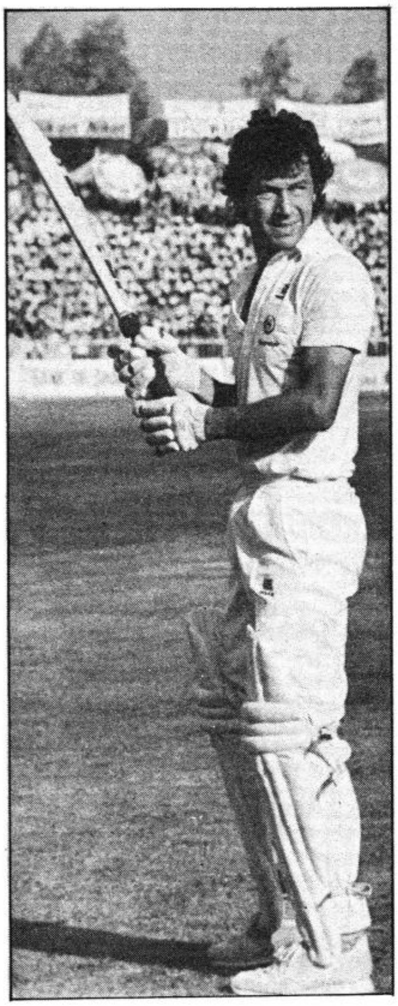

ইমরান খান

ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'বিগ বার্ড' জোয়েল গার্নারের এক ওভারে তিনটি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন

খানের অপরাজিত ৮৬ রানের সহায়তায় চার উইকেটে ১৯৬ রান করে। ইমরান নট আউট ২৫। এইখানে আমরা একটু থামব। কারণ, কয়েক বছর পরে স্কোরকার্ডের দিকে তাকালে বুঝতেই পারব না ইমরানের নামের পাশে লেখা বোবা সংখ্যাগুলোর মধ্যে কত কথা জমে আছে। কোনও কোনও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন যে, সীমায়িত ওভার ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্টবোলার গার্নারকে নাকি মারা যায় না। গার্নারকে মারলেন (নাকি থেঁতলে দিলেন) ইমরান, এক ওভারে তিনটি ছক্কা। প্রমাণ হল, ব্যাটসম্যানের হৃদযন্ত্রটির আকার বড় হলে বিপক্ষের ভয়ঙ্করতম বোলারটিকেও বেদম ঠ্যাঙানো যায়, এমনকী তাঁর নাম জোয়েল গার্নার হলেও। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন উইকেট হারিয়েই ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলে। রিচি রিচার্ডসন নট আউট থাকেন ৯৯ রানে।

দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় ভারত-পাকিস্তান। ভারত টসে জিতে ব্যাট করতে পাঠায় পাকিস্তানকে। মুদাস্সরের ৬৭ রান এবং রামিজ রাজার ৬৬ রানের সুবাদে পাকিস্তান ৪৫ ওভারে পৌঁছয় ২০৩-৪। সীমায়িত ওভার ক্রিকেটে ২০৪ রান করে ম্যাচ জেতা খুব একটা কঠিন কাজ মোটেই নয়। অথচ সেই কাজটাই করতে পারলেন না ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। একমাত্র গাওস্করের ৬৩ ছাড়া আর কোনও ব্যাটসম্যানই উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারলেন না। ভারত হেরে গেল ৪৮ রানে।

এই ম্যাচে পরাজয়ের ফলে অবস্থাটা দাঁড়াল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতকে জিততে হলে ২৪৫ রান করতেই হবে এবং বিপক্ষকে অল আউট করতে হবে ১৯৬ রানের মধ্যে। টস জিতে ভারত ব্যাট শুরু করে। এবং একদিনের ক্রিকেটের অন্যতম সেরা আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান শ্রীকান্ত সহ মহিন্দর ও বেঙ্গসরকরের উইকেট দ্রুত হারায় মাত্র ২৬ রানে। গাওস্কর এমনিতেই ৪৫ বলে শম্বুক গতিতে করেছিলেন ৩ রান, উইকেট পড়ে যাওয়ায় তিনিও জানলা-দরজা বন্ধ করে দেন। যেখানে ৪৫ ওভারে ২৪৫ রান না করলে ভারতের জেতার কোনও সম্ভাবনাই নেই, সেখানে গাওস্কর-আজহার জুড়ি খুঁটে-খুঁটে রান করতে লাগলেন (যেন পাঁচ দিনের টেস্ট ম্যাচ খেলছেন)। দু'জনের যোগাযোগে ১০০ রান যোগ হল এবং খেলার অন্তিম পর্বে গাওস্কর হাত খুললেও তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। গাওস্কর নট আউট রইলেন পুরো ৪৫ ওভার খেলে ৭৬ রানে। ভারত করল ৬ উইকেটে ১৮০ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে এটা কোনও চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো রানই নয়। ৪১·৩ ওভারে মাত্র দুটি উইকেট খুইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ জিতে নিল অনায়াসে। রিচার্ডসন ৭২ রানে আউট হলেও হেনেস অপরাজিত রইলেন ৭২ রানে। 'ম্যান অব দ্য সিরিজে'র পুরস্কার হিসেবে একটা ঝকঝকে মোটরগাড়ি পেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রিচি রিচার্ডসন।

শিগ্‌গির! আপনার টুথব্রাশের নাম কি বলুন!

বেশীর ভাগ লোকই ঐ বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখেন না— শুধু, যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন তাঁরা ছাড়া।

সব টুথব্রাশ সমানভাবে তৈরী করা হয় না।

ফরহ্যান্স টুথব্রাশ অন্যগুলির চেয়ে সেরা।

এর ডবল অ্যাকশন, একাধারে দাঁতও সাফ করে আবার মাড়িও মালিশ করে।

আপনি আপনার টুথপেস্ট বেছে নেন খুবই যত্নভরে তাই না? তাহলে আপনার টুথব্রাশও ফরহ্যান্স-ই হওয়া উচিত কিনা বলুন!

ফরহ্যান্স

ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ

অ্যাডাল্ট, জুনিয়ার ও অ্যাঙ্গুলার ডিলাক্স

407-GM-241-BEN

হায়, ভারত

অশোক রায়

ছ'দেশের চ্যাম্পিয়ানস কাপ হকি টুর্নামেন্টে বিজয়ী হল অস্ট্রেলিয়া। আর ভারত? খুবই লজ্জা করছে লিখতে, ভারত পেয়েছে সর্বশেষ স্থান।

ভারত কিন্তু শুরুটা মন্দ করেনি। প্রথম ম্যাচে তারা মুখোমুখি হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। কিছুদিন আগে ভারত-পাকিস্তান খেলা মানেই ছিল

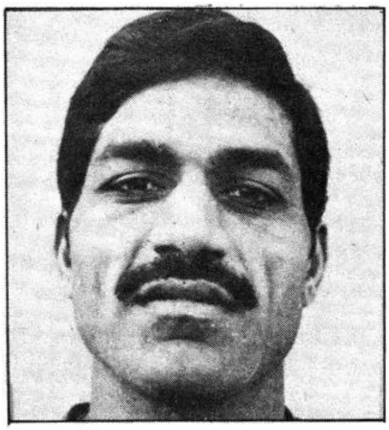

জালালউদ্দিন

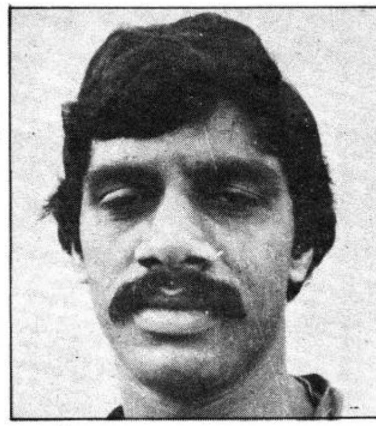

কার্ভালিহো

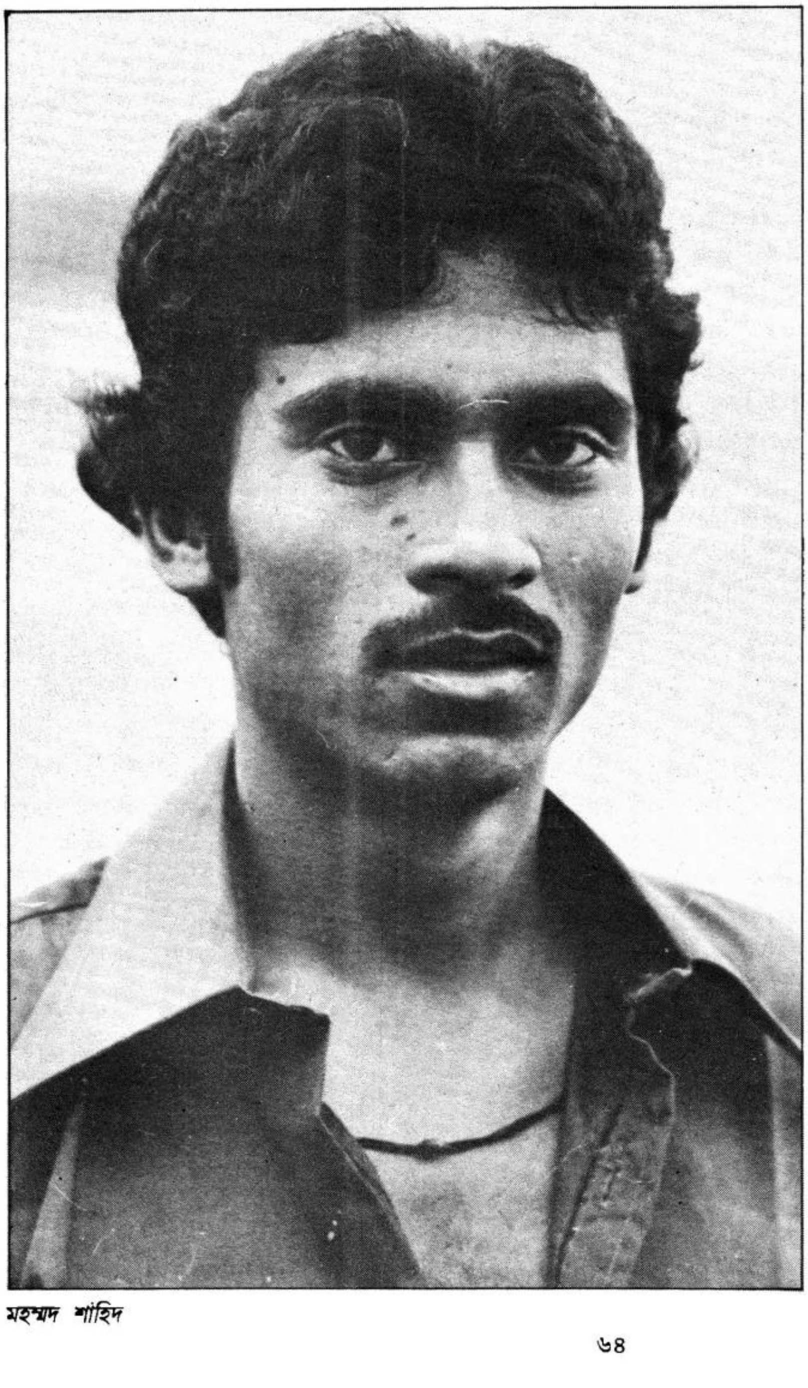

মহম্মদ শাহিদ

টেনশন। কিন্তু দিল্লিতে '৮২ সালের এশিয়ান গেমসে চোখের সামনে ভারতকে গুনে গুনে আধ ডজনের ওপর গোল খেতে দেখেছিলাম বলেই এখন খেলা আরম্ভের আগেই ভাবতে থাকি, এই বুঝি ভারত গোল খেতে শুরু করল।

খেলা আরম্ভের দু'মিনিটের মধ্যেই হাসান সরদারের গোলে পাকিস্তান এগিয়ে যায়। মনে হয়েছিল আর বুঝি নিস্তার নেই। কিন্তু ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন শাহিদ, চমৎকার গোল করে। খেলার ফল ১-১ হতেই ভারতীয় দলটা যেন জেগে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মহিন্দর পাল সিংয়ের পেনাল্টি কর্নারে ভারত ম্যাচ জিতে যায় ২-১ গোলে। দীর্ঘ তিন বছর পরে সরকারি টুর্নামেন্টে ভারত হারাল পাকিস্তানকে।

পাকিস্তানকে পরাজিত করে ভারত যতটা আশা জাগিয়েছিল, পরের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১-৪ গোলে হেরে ঠিক ততটাই নিরাশ করল। এ-ম্যাচে ভারতের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন দলের অধিনায়ক শাহিদ। তৃতীয় ম্যাচে ভারত প্রতিযোগিতার সেরা খেলা খেলল পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে। ভাবতে পার, খেলা শেষ হবার মাত্র ১০ মিনিট আগেও ভারত পিছিয়ে ছিল ১-৫ গোলে। শেষ দশ মিনিটে যেন জ্বলে ওঠে তারা। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে ভারত একটা একটা করে গোল শোধ দিতে শুরু করে। খেলার শেষ বাঁশি বাজতে যখন আর মাত্র এক সেকেণ্ড বাকি, তখন পেনাল্টি স্ট্রোক পায় ভারত। দুর্দান্ত স্নায়ুচাপের মধ্যে গোল করেন হাফব্যাক কার্ভালিহো। খেলা

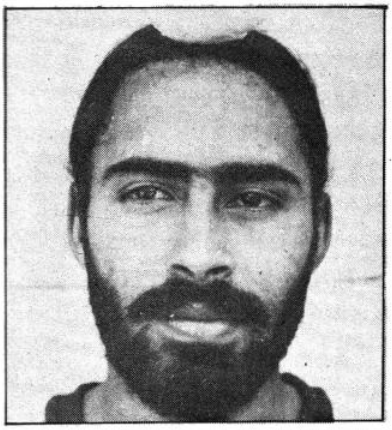

পারগত সিং

ভারত নাটকীয়ভাবে ০-৩ গোলে হেরে গেল দুর্বল হল্যাণ্ডের বিপক্ষে। কোথায় গেল আগের দিনের স্বপ্নময়, ছন্দোময় হকি ; ভারত খেলল জঘন্যতম খেলা। শেষ খেলায় ভারত মুখোমুখি হল ওলিম্পিকে ব্রোঞ্জপদকজয়ী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে। প্রথম গোল করেও সেই খেলাতে ভারত হেরে গেল ১-২ গোলে। ভারতের পক্ষে গোলটি করেন কার্ভালহো, পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে। পাঁচটি ম্যাচে ১৫ গোল খেয়ে ভারত পেল শেষ স্থান।

অস্ট্রেলিয়া টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ানস কাপ জিতলেও, শেষ ম্যাচে তাদের হার মানতে হয় পাকিস্তানের কাছে ১-৩ গোলে। পাকিস্তান চতুর্থ স্থান পেলেও তাদের একমাত্র সান্ত্বনা, চ্যাম্পিয়ান টিমকেই তারা হারাতে পেরেছে।

শেষ হল ৫-৫। আগের গোলগুলি করেন জালালউদ্দিন, মহিন্দর পাল সিং, শাহিদ ও পারগত সিং।

শক্তিশালী পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে চমৎকার ড্রয়ের ঠিক পরের ম্যাচেই

শিশু-উৎসবের মজার অনুষ্ঠান

তোমরা তো জানো, ১৪ নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। আর, চাচা নেহরুর সঙ্গে ছোটদের সম্পর্কের কথা মনে রেখে, ওই দিনটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'শিশুদিবস' নামে। এ-বছর শিশুদিবস উপলক্ষে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের উদ্যোগে খুব জমজমাটভাবে পালন করা হল শিশুদিবস।

রবীন্দ্রসদনে ছিল এই অনুষ্ঠান। প্রেমেন্দ্র মিত্র সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন শিশুদিবসের তাৎপর্য, অমিতাভ চৌধুরী শোনালেন ছড়া, গল্প বললেন ইন্দিরাদি, পার্থ ঘোষ তুলে ধরলেন নানান মজার ফাঁকে-ফাঁকে নেহরুর জীবনী। ছোট্ট ঋজু বসু তার 'সভাপতির ভাষণে' বলল, প্রত্যেকের উচিত সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। আরেক ছোট্ট রাজানারায়ণ দেব বাজাল অর্গান, প্রতিবন্ধী মেয়ে রঞ্জনা মান্না গাইল নজরুলগীতি, মিষ্টি-মিষ্টি ছড়ার গান শোনাল 'আলাপ'-এর ছেলেমেয়েরা।

আরও অনেক-অনেক অনুষ্ঠান ছিল। 'আবোলতাবোল'-এর ছড়াকে নাচে-গানে হাজির করল 'মল্লার'-এর খুদে শিল্পীরা। 'শিশু রূপম' মঞ্চস্থ করল 'শিলাদিত্য', অবন ঠাকুরের গল্প থেকে তৈরি নাটক।

তবে সব থেকে চমক-জাগানো ছিল ম্যাজিক। আনন্দমেলায় যিনি তোমাদের ম্যাজিক শেখান, সেই জাদুকর তাপস বসু অবাক-করা সব কাণ্ড করলেন। আগুন থেকে বেরুল পায়রা, পায়রা হয়ে গেল নেহরুর প্রিয় লাল গোলাপ। একটি ছোট্ট মেয়ের বুক থেকে বেরুল নেহরুর ছবি, শূন্য থেকে মালা এল, ফুল এল—নেহরু-প্রণামের জন্য, এলোমেলো সংখ্যা থেকে বেরুল নেহরুর জন্মসাল। এ সবই ঘটল পলকে। কী কাণ্ড একবার ভেবে দ্যাখো।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

"একটা টুথব্রাশ বাছা নিয়ে এত হৈচৈ?"

বেশীর ভাগ লোকই ও ব্যাপারটিকে ঐ দৃষ্টি দিয়েই দেখেন— শুধু, যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন তাঁরা ছাড়া!

সব টুথব্রাশ সমানভাবে তৈরী করা হয় না!

ফরহ্যান্স টুথব্রাশ অন্যগুলির চেয়ে সেরা।

এর ডবল অ্যাকশন, একাধারে দাঁতও সাফ করে আবার মাড়িও মালিশ করে।

আপনি আপনার টুথপেস্ট বেছে নেন খুবই যত্নভরে তাই না? তাহলে আপনার টুথব্রাশও ফরহ্যান্স-ই হওয়া উচিত কিনা বলুন!

ফরহ্যান্স

ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ

অ্যাডাল্ট, জুনিয়ার ও অ্যাঙ্গুলার ডিলাক্স

409-GM-241-BEN

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সুব্রত সিংহ

দেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে যে সাফল্য অর্জন করেছিল, তা অব্যাহত রাখতে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা পাকিস্তান পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আশা পূর্ণ হয়নি। তিন টেস্ট সিরিজের দুটিতে ও চারটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সব কটিতেই তাঁরা হেরেছেন।

টেস্ট সিরিজ হারার আগেই শ্রীলঙ্কা হেরে বসেছিল একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সিরিজে। পেশোয়ারে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস মাত্র ১৪৫ রানে শেষ করে দিয়ে পাকিস্তান ম্যাচ পকেটস্থ করেছিল মাত্র ২টি উইকেট খুইয়েই। পাকিস্তানের জয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছিল সোয়াইব মহম্মদ (৭২ নঃ আঃ) ও মুদাস্‌সর নজরের (৪০) ব্যাটিং-কৃতিত্বে। ব্যাটে ৪০ রান করা ছাড়াও বোলিং-এ দুটি উইকেট নেওয়ায় মুদাস্‌সর পেয়ে যান 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'-এর সম্মান।

এরপর তিন টেস্ট সিরিজে ফয়সালাবাদের প্রথম টেস্টে 'টস' জিতে ব্যাটিং উইকেটে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দলীপ মেণ্ডিস সঠিকভাবেই প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেও খেলার শুরুতে ব্যাটসম্যানরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বিপর্যয় তাঁরা কাটিয়ে ওঠেন দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান অরবিন্দ ডি'সিলভার অনবদ্য একটি ১২২ রানের ইনিংসের জন্য। তাঁর এই লড়াকু ইনিংস তাঁকে এনে দিয়েছিল ম্যান অব দ্য ম্যাচের সম্মান।

পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানেরা অনায়াস ভঙ্গিতে খেলে প্রমাণ করে দিলেন, শ্রীলঙ্কার বোলিং-আক্রমণকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। শ্রীলঙ্কার ৪৭৯ রানের জবাব পাকিস্তান দিয়েছিল বিরাট রানের ইনিংস (৫৫৫-৩) গড়ে।

প্রশংসনীয়ভাবে প্রথম টেস্ট ড্র করে গুজরানওয়ালায় দ্বিতীয় ও লাহোরের তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচেও যথেষ্ট লড়াই করেই তবে শ্রীলঙ্কা দল হার স্বীকার করেছিল। গুজরানওয়ালায় পাকিস্তানের ৫ উইকেটে ২২৪ রানকে তাড়া করে শ্রীলঙ্কা শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৫ রানের জন্য জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। আর লাহোরে শ্রীলঙ্কার ৭ উইকেটে ২২৮ রানকে তাড়া করে পাকিস্তান ৯ বল বাকি থাকতেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল।

চারটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সিরিজের একটি বাকি থাকতেই ওই সিরিজ হেরে শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমেছিল শিয়ালকোটে। এই টেস্টে ইমরান একাই প্রায় শ্রীলঙ্কাকে ধরাশায়ী করেছিলেন। পায়ের সিনবোনে আঘাতের জন্য বহুদিন টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে থাকার পর এই সিরিজে ফিরে এসে ইমরান জানিয়ে দিলেন এতদিনের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি কিছুই হারাননি। এই টেস্টের দু ইনিংসে তাঁর শিকার ৯টি উইকেট, মাত্র ৯৩ রানে। ইমরানের মারাত্মক বোলিং-এ (৪-৫৫) শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫৭ রানে শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানকেও কিন্তু খুব বেশি রান করতে দেননি শ্রীলঙ্কার মিডিয়াম পেসার রবি রত্নায়েকে। জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং (৮-৮৩) করে রবি একাই পাকিস্তানকে বেঁধে রেখেছিল মাত্র ২৫৯ রানে। রবির এই বোলিং অ্যাভারেজ শুধু তাঁর নিজের নয়, যে-কোনও শ্রীলঙ্কার বোলারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রবির পরিশ্রম একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায় তাঁদের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। মাত্র ২০০ রানেই শেষ হয়ে যায় তাঁদের দ্বিতীয় ইনিংস। একমাত্র রঞ্জন মদুগালে (৬৫) কিছুটা লড়াই চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ইনিংসে ইমরান প্রথম ইনিংসের চেয়েও আরও বেশি মারাত্মক (৫-৩৮) হয়ে উঠেছিলেন। তবে ম্যান অব দ্য ম্যাচের সম্মান পেয়েছিলেন কিন্তু রবি রত্নায়েকে। শেষ পর্যন্ত জয়ের প্রয়োজনীয় ৯৯ রান পাকিস্তান ২ উইকেট খুইয়েই তুলে নিয়ে সিরিজে ১-০-তে এগিয়ে যায়।

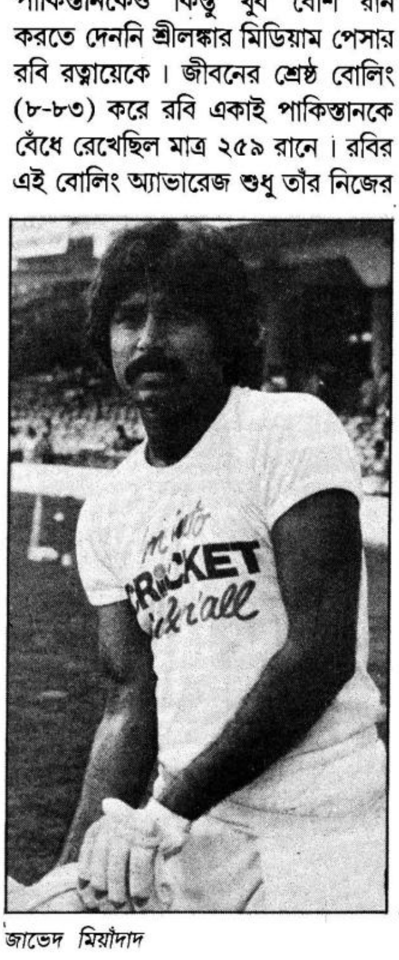

জাভেদ মিয়াঁদাদ

তৃতীয় টেস্টের আগে হায়দরাবাদে চতুর্থ আন্তর্জাতিক ম্যাচে শ্রীলঙ্কার আবার হার হয় ৮৯ রানে। টস জিতে মেণ্ডিস পাকিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে নির্ধারিত ৩৯ ওভারে ৭ উইকেটে ২১৬ রানে বেঁধে রাখলেও ব্যাটসম্যানদের চরম ব্যর্থতায় সবাই আউট হয়ে যান মাত্র ১২৭ রানে। একমাত্র মেণ্ডিস (৪৬) ছাড়া আর কেউই পাকিস্তানের বোলারদের মোকাবিলা করতে পারেননি।

সফরের শেষ খেলাটি ছিল করাচির তৃতীয় টেস্ট। এই টেস্ট জিতে শ্রীলঙ্কার টেস্ট সিরিজ ড্র করাই ছিল একমাত্র আশা। কিন্তু এমন কিছু রসদ শ্রীলঙ্কার ভাণ্ডারে মজুত ছিল না, যা দিয়ে পাকিস্তানকে তারা হারাতে পারত। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশামতোই পাকিস্তান এই টেস্ট জিতে নেয় ১০ উইকেটে। ফলে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সিরিজের মতো টেস্ট সিরিজও অনায়াসে জিতে নেয় পাস্তিান। তবে এই হারের মধ্যেও তাদের অরবিন্দ ডি'সিলভার দ্বিতীয় ইনিংসে লড়াকু ব্যাটিং-এর (১০৫) জন্য ম্যান অব দ্য ম্যাচের সম্মান পাওয়াই একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে রইল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও প্রথম টেস্টে ও দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচেও তিনি এই সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর এই ধারাবাহিক ব্যাটিং সাফল্যের জন্য 'ম্যান অব দ্য সিরিজ'ও হয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের পক্ষে 'ম্যান অব দ্য সিরিজ'-এর সম্মান পেয়েছেন অধিনায়ক জাভেদ মিয়াঁদাদ।

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে

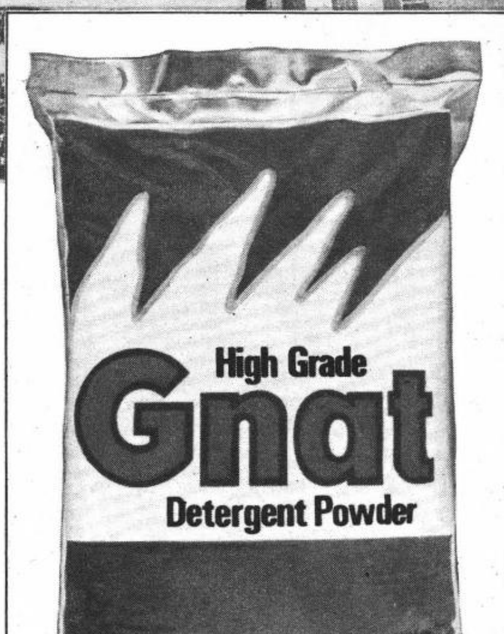

অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি—

এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product | আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

ANANDAMELA 25DECEMBER, 1985, Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731